Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মনিরা আক্তার

রোলঃ 228021158

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মনিরা আক্তার

রোলঃ 228021158

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মনিরা আক্তার, আইডিঃ 228021158 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মনিরা আক্তার

আইডিঃ 228021158

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:..8

বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যাবস্থা: 8

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যাবস্থাঃ..9

এক নতুন অর্থব্যাবস্থার প্রয়োজন : 10

অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এ ইসলামের ভূমিকা :...10

সম্পদের প্রকারভেদ :..11

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নীতি :..11

সম্পত্তিতে মালিকানা লাভের উপায় : 12

ইসলামের শিল্পনীতি : 14

যৌথ কারবার : 16

শ্রম, শ্রমিক ও মজুরি সমস্যা :..17

শ্রমিকের মর্যাদা :..17

মজুরি সমস্যা :..18

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য :..20

শ্রমিকদের অধিকার :...20

সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে পার্থক্য : 21

সোভিয়েতরাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা :...21

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক :..22

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ : 25

ইসলামী ব্যাংক:...26

বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক :..29

বিল অব এক্সচেঞ্জ-এ অর্থ বিনিয়োগ:...37

কৃষি লোনে অর্থ বিনিয়োগ...38

মূলধনের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা:-..39
ব্যত্তিগত প্রয়োজনে ঋণ দান..39
ইসলামী রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক..41
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:-..42
বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক:-..46
উন্নয়ন :-..49
পরিকল্পনা :-..52
ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি :..59
রাষ্ট্রীয় আয় :-..59
ইসলামী শরীয়তে ওশরের পরিমাণ :-..62
খারাজ:-..62
বিভিন্ন সম্পদের এক পঞ্চমাংশ :-..62
একাধিকার ভুক্ত ব্যবসায়ের রাজস্ব :-..63
বন-সম্পদ আয় :-..63
সামুদ্রিক সম্পদের আয় :-..63
মালিকবিহীন সম্পদ :-..63
যাকাত ও সাদকা:-..64
নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ..66
আমদানি শুল্ক :-..68
জরুরী পরিস্থিতিতে কর ধার্যকরণ:-..68
সরকারি ঋণ :-..69
সরকারী ঋণের প্রকারভেদ:-..69
রাষ্ট্রীয় ব্যয় :-..71
কুরআনের নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত:-..74

(ক) বেকার শ্রমজীবী ও রুজিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা:-..75

(খ) মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা:-..76

(গ)অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা :-..76

(ঘ) যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:-..77

(ঙ) মুসলিমদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা:- 77

(ছ)ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা :- 79

(জ) বিনাসুদে ঋণ দান:-...79

(ঝ) ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা:- 80

(ঞ) নিঃস্ব পথিকদের পাথেয় সংস্থান:-...80

৩ লা-ওয়ারিস শিশু সন্তান প্রতিপালন:-...81

৫.ক্ষতিপূরণ দান:-..82

৬.অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা:-...82

৭.বায়তুল মাল হইতে জনগনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান:- 84

ইসলামী অর্থনীতিতে ভুমি বন্টন নীতি:-..84

ভূমির ভোগাধিকার লাভের ইসলামী নীতি:- 86

নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনেরআমলে জমি বন্টন নীতি:-.................................88

ভূমি উন্নয়ন ও বন্টন:- 93

ভূমিকা:

অর্থনীতি মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল বর্তমানে পৃথিবীতে যে কয়টি অর্থব্যাবস্থা চালু রয়েছে তা মানুষের প্রয়োজন কে পুরা করিতে পারিতেছে না।বরং এই অর্থব্যাবস্থা হইয়া উঠিয়াছে মানুষের শোষন ও বন্চনার কারন।গরীব দিনদিন গরীব হইতেছে আর ধনী দিন দিন ধনী হইতেছে।এ যে এক বিরাট বৈষম্য এবং মানুষের জন্য বিষফোড়াস্বরূপ।মানুষ যুগেযুগে চিন্তা করিয়াছে কিভাবে মানুষ কে মুক্তি দেয়া যায়।পুজিবাদী অর্থব্যাবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যাবস্থা দাড়িয়েছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য।মানুষের কখনো মুক্তি মিলেনাই।দরিদ্র দরিদ্র ই রহিয়াছে।কোটি কোটি মানুষ অন্নবস্ত্রহীন রহিয়াছে আবার কোটি মানুষ রহিয়াছে যারা সব সম্পদ একাই কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে।ইহার কি সমাধান হতে পারে?? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতএব সব সমস্যার সমাধান তারই কাছে।আল্লাহ তায়ালা মানুষ কে জীবনের সব বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন।এমনভাবে অর্থনীতিতে ও রয়েছে সুন্দর বিধিনিষেধ। আমরা এ বক্ষমান গ্রন্থে দেখাবো যে কিভাবে ইসলামীক অর্থনীতি ব্যাবস্থা মানুষ কে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে।এখনই সব থেকে উত্তম সময় সব পুরনো অর্থব্যাবস্থাকে ছুড়ে ফেলে ইসলানী অর্থব্যাবস্থা চালু করার।

বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যাবস্থা:

বর্তমানে পৃথিবীতে দুইটি অর্থ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হলো পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এবং অপরটি হল সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা :

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হইতেছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। ব্যক্তি তার ইচ্ছামত সম্পদ মালিকানায় রাখতে পারে এবং ইচ্ছামত যে কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। এবং এখানে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ থাকেনা। যার দরুন সমাজে কেউ কেউ ব্যবসা করে ধনী থেকে ধনী হইতেছে

এবং কেউ কেউ গরিব থেকে গরিব হইতেছে। কারন সহজলভ্য শ্রমে ব্যাবসায়ীরা দিনমজুর বা শ্রমিক খাটাইতে পারতেছে শ্রমিকের বেশি যোগান থাকার কারনে এবং শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য পাইতেছে না।একারনে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীরা কম বিনিয়োগে বেশি লাভ করতেছে এবং শ্রমিকরা তার মৌলিক প্রয়োজন পুরা করতে পারতেছে না। সমাজে ধ্বনি ও দরিদ্রদের মধ্যে বিশাল তফাৎ তৈরি হইতেছে। যার কারনে সামাজিক ভারসাম্য হারাইতেছে। দরিদ্ররা সবসময়ই শোষণ বঞ্চনার শিকার হইতেছে। এজন্য বলা যায় যে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সামাজিক সমস্যা নিরাময়ের বদলে দিন দিন বাড়াইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যাবস্থাঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি হলো ব্যক্তি মালিকানায় কোন সম্পদ থাকতে পারিবে না। সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকিবে এবং ব্যক্তির শ্রম অনুযায়ী সে পারিশ্রমিক দেবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূল কথা ছিল যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দেখা যায় তাই ব্যক্তি মালিকানায় কোন সম্পদ থাকতে পারবে না সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে। ব্যক্তি তার শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা দাঁড় করানোর সময় অনেক বেশি প্রলোভন দেখানো হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হলে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে নাকিন্তু দেখা গেল যে এই অর্থ ব্যবস্থায় আরো বেশি জুলুম নিপীড়ন শুরু হলো এবং মানুষে মানুষে আরো বেশি বৈষম্য দেখা গে সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকার কারণে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতো তাদের একতরফা দখলদারীত্বে সকল সম্পদ চলে এলো এবং শ্রমিকরা তার পরিশ্রম অনুযায়ী খুবই কম পারিশ্রমিক পেতো এবং এই অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে থাকলো। মানুষ স্বাধীন মত কোন ব্যবসা না করতে পারার কারণে অনেক মানুষের কর্মস্পৃহা হারিয়ে গেল। যার ফলে যে ফলাফল বা আশা

দেখিয়ে সমাজতন্ত্র দাঁড় করানো হয়েছিল তা একেবারেই ভেস্তে গেল। বরঞ্চ দেখা গেল যে পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার থেকেও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দরিদ্র আরো বেশি বৈষম্যের শিকার হতে থাকলো। এজন্য বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবংপুজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা কোনটি মানুষকে বৈষম্যের শিকার হতে মুক্তি দিতে পারেনি। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি।

এক নতুন অর্থব্যাবস্থার প্রয়োজন :

এখন সময়ের দাবী এক নতুন অর্থব্যাবস্থা।যেহেতু পুজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র কেউ ই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি তাই আর নয় মানবরচিত অর্থব্যাবস্থা।এখন এমন এক অর্থব্যাবস্থার দিকে ফিরে যেতে হবে যা বিশ্বমানবের সৃষ্টিকর্তা প্রনয়ন করেছেন।ইসলামীক অর্থব্যাবস্থাই পারবে মানুষকে বৈষম্য, জুলুম, নিপীড়ন হতে মুক্তি দিতে।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এ ইসলামের ভূমিকা :

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাবো ইসলামে অর্থনীতির স্বরূপ এবং কিভাবে তা মানব সভ্যতাকে মুক্তি দিতে পারে বা আলোর পথা দেখাতে পারে,একটি বৈষম্যহীন সমাজ নির্মান করতে পারে।এখানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো:

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের মালিকানা:

পুজিবাদী অর্থব্যাবস্থায় সম্পদের মালিক হল ব্যাক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যাবস্থায় সম্পদের মালিক হল রাষ্ট্র। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যাবস্থায় ব্যাক্তি বা রাষ্ট্র কারোই সপদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা নেই।ইসলামের মৌল ঘোষণা হল, ধন-সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকত্ব ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ

সুবহানাহু তায়ালা। মানুষ হলো সম্পদের আমানতদার মাত্র। রাষ্ট্র বা ব্যাক্তি চাইলেই তার মর্জি মত আয় ও ব্যায় করিতে পারিবে না।আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই সবকিছু করিতে হইবে।কুরআনে বলা হইয়াছে-

“আকাশমন্ডলে যাহা কিছু আছে,যাহা কিছু আছে জমিনে, তাহার সবকিছুই আল্লাহর জন্য - আল্লাহর মালিকানাধীন।”

সম্পদের প্রকারভেদ :

সম্পদ দুই প্রকার:

১.স্বভাবজাত বা নৈসর্গিক - যাহা প্রস্তুত করিতে মানুষের কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নাই।

২.আর দ্বিতীয় হইতেছে মানুষের শ্রমলব্ধ উপাদান এবং শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ উৎপাদিত পণ্যরাজী।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নীতি :

প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে ইসলাম বলে ইহাতে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে।ইহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা।সকল নাগরিকই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য উহা হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামগ্রী অবাধে গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য কোন মূল্য আদায় করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যাইতে পারে না।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

যেসব জিনিস সাধারণভাবে সকল মুসলমানের অত্যাবশ্যকীয় যেমন খাল,নদী বা সমুদ্র যাহা হইতে সকলেই পানি পান করে কিংবা লবণের আকর যাহা সমস্ত এলাকাবাসীর জন্য জরুরী তাহা কাহারো ব্যক্তিগত মালিকানায় দান করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের নাই।

ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইলো জনসাধারণের জন্য যাহা একেবারে জরুরী রাষ্ট্রপ্রধান তাহার মালিকানায় নিতে পারেন না।

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ :
ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার সম্পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। ব্যক্তি তার শ্রমলব্ধ সম্পদ নিজে ভোগ করতে পারিবে আমানতদারিতার সাথে। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ তাআলা হলেন সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ সৃষ্টিকর্তা আর আল্লাহর দেওয়া আমানতি মালিকানা অধিকারের ভিত্তিতে এইসবের ভোগ ব্যবহার করিয়া মানুষ আল্লাহর এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিবে।ইহাই হইল আল্লাহর সৃষ্টি নিরঙ্কুশতার মোকাবিলায় মানুষের মালিকানা তত্ত্বের সঠিক তাৎপর্য।

সম্পত্তিতে মালিকানা লাভের উপায় :

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের সঙ্গত উপায় মোটামুটি ভাবে সাতটি।

১.প্রথম দখল: প্রাকৃতিক সম্পদ যা কাহারো মালিকানায় নাই তাহা যে ব্যাক্তি সর্বপ্রথম দখল করিবে।এই বন্টন অবশ্যই সরকার কর্তৃক হইতে হইবে।

২.আবিষ্কার -উদ্ভাবন : মানসিক শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে কোন জিনিস আবিষ্কার করা,কোন যন্ত্র প্রস্তুত করা তাহা কোন আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া হইলেও ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের দ্বিতীয় উপায়। এই উপায়ে উদ্ভাবিত সকল জিনিসই উহার মালিক উপযুক্ত মূল্যের বিনিময় সে উহা বিক্রয় করিতে ও হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩.ইসলামী রাষ্ট্র সরকারের অনুসৃত বন্টন নীতি অনুযায়ী অংশ লাভ :সরকার হইতে কাহাকেও কোন সম্পত্তি দান। ইসলামের দৃষ্টিতে মালিকানা লাভের ই-হাও

একটি উপায়। ইহা শুধু একটি উপায়ে নয় ইহা অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তবে শর্ত এই যে ঠিক যে উদ্দেশ্যে তাহা দেওয়া হইবে তাহা তাহাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে

৪.শ্রম : ব্যক্তির পরিশ্রম ও মালিকানা লাভের একটি উপায়। অতএব মানুষ পরিশ্রম করিয়া এমন সব কাঁচামাল দ্বারা কোন জিনিস প্রস্তুত করলে যাহার উপর ইতিপূর্বে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হয় নাই মেহনতি ব্যক্তি উহার মালিক হইবে। এই কারণে শ্রম ও মানুষের বিক্রয় যোগ্য একটি সম্পদ তাই সম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হইবে।

৫.উত্তরাধিকার নীতি : উত্তরাধিকার সূত্রে এক এক ব্যক্তি যে সম্পদ সম্পত্তি লাভ করে তাহার উপর সেই ব্যক্তির মালিকানা স্স্বীকৃত হইবে। শ্রম - মেহনত ই যে মালিকানা লাভের একমাত্র উপায় নয় ইসলামের এই উত্তরাধিকার নীতি উহার একমাত্র প্রমাণ।

৬.ক্রয় বা বিনিময় : উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কোন কিছু ক্রয় করা এবং দুইটি পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় করাও এক কথায় বাণিজ্য করাও মালিকানা লাভের সঙ্গত উপায়।

৭.উপহার- উপঢৌকন : ইসলামী সমাজে পরস্পরের মধ্যে অর্থ ও উপঢৌকন আদান-প্রদান এবং ভালোবাসার উপহার ও মালিকানা লাভের অন্যতম উপায়। ফিকহের পরিভাষায় এই ধরনের দান ও উপঢৌকন কে বলা হয় হেবা। যাহার জন্য হেবা করা হইবে সে উহার মালিক হইবে।
ওসিয়ত সূত্রে পাওয়া সম্পাদ ওসম্পত্তিতে ও ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত এবং মালিকানা লাভের ইহাও একটি উপায়। কেননা ওসিয়ত বলা হয় অন্য লোককে কোন কিছুর মালিক বানাইয়া দেওয়াকে।

ইসলামের শিল্পনীতি :

মূলধন বিনিয়োগের পন্থা : ইসলামী সমাজে ব্যক্তির হাতে মূলধন সঞ্চিত হইতে পারে, ব্যাক্তিগতভাবে উহার প্রয়োগ ও বিনিয়োগ হইতে পারে, তাতে কোনরূপ আপত্তি করা চলে না। মূলধন বিনিয়োগের প্রথম পন্থা এই যে ব্যক্তি নিজেই নিজের মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায় করিবে, বানিজ্য করিবে, শিল্প উৎপাদনের কাজে টাকা খাটাইয়া কারখানা স্থাপন করিবে এবং সেজন্য শ্রমিক নিযুক্ত করিবে। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামিক সমাজে চিরদিনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আজ ও ব্যাক্তিগত মালিকানার সূত্রে ব্যবসায় কিংবা শিল্প উৎপাদনের কাজে মূলধন বিনিয়োগ হইতে পারে, তাহা হইতে মুনাফা লাভ কিংবা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজ ও জাতি তাহা হয়তো উপকৃত ও লাভবান হইতে পারে।
ব্যক্তি বিশেষ নিজের তত্ত্বাবধানে মজুর শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইতে পারে। এইভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক অসংখ্য কারখানা ও পণ্য উৎপাদনকারী পরিচালিত হইতে পারে। ইসলামী সমাজ ইতিহাসের স্বর্ণযুগের কাজ করাইতে কোন বাধাবিঘ্ন ছিল না আজও থাকিতে পারে না ।

ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের আরেকটি পন্থা হইতেছে একজনের মূলধন অপরজনের শ্রমের সাথে যুক্ত হইয়া কোন অর্থকরী কাজের সূচনা করা। আরবি ভাষার এধরনের কাজকে কিরাজ বা মুজারিবাত বলা হয়, আর ইংরেজিতে বলা হয় স্লিপিং পার্টনারশিপ। একজন মূলধন দেয় অপরজন সেই মূলধন লাগাইয়া পরিশ্রম করে অর্থ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে। এইভাবে কাজ করার পর যে সম্পদ মুনাফা হিসেবে লাভ হয় তাহা পূর্ব নির্ধারিত অংশ ও হার অনুযায়ী নিয়মিতভাবে উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হয়। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে কিরাজের ইহাই সর্ববাদী সম্মত সংজ্ঞা।

মূলধন বিনিয়োগের উল্লেখিত দুটি পন্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথম পন্থায় শ্রমিকের নির্দিষ্ট মজুরি যথাসময় আদায় করা পুঁজি মালিকের দায়িত্ব। তাহা নিজের লাভ হোক বা লোকসান হোক, কম লাভ হোক কি বেশি হোক মজুরি নির্দিষ্ট পরিমাণে তাহাকে অবশ্যই দিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার কাজে কিরাজ বা মুজারিবাতএর শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় না। নির্দিষ্ট হয় লভ্যাংশের হার। ঈকাজেই তাহাতে মুনাফা হলে শ্রমিক ও পুজি মালিকগণ লভ্যাংশ পাইতে পারে। মুনাফার পরিমাণ অনুপাতে পূর্ব নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী তাহারা তাহা পাইবে আর লাভ না হলে কিছুই পাইবেনা।

মূলধন বলিতে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না প্রত্যেক উৎপাদক শক্তিও যন্ত্রই মূলধন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অতএব চাষের জমি কারখানা ও কোন যন্ত্রপাতিকে কেন্দ্র করিয়া অর্থ উৎপাদনের উল্লেখিত পন্থায় কাজ হইতে পারে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা নাজায়েজ হইবে না।এই কর্মনীতির আলোকে বর্তমান যুগের ইসলামী সমাজেএকটি প্রেস, একটি কারখানা, একটি আড়ৎ ও একটি মোটর গাড়ির ইত্যাদি কে ভিত্তি করিয়া অনুরূপভাবে অর্থ উৎপাদনের কাজ হইতে পারে এবং তৎলব্ধ মুনাফা উৎপাদনের যন্ত্রের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বন্টন হতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম ও অনুরূপভাবে কাজ করিয়াছেন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কোন কোন লোককে নগদ টাকা বা কোন উৎপাদন যন্ত্র অনুযায়ী দিয়েছিলেন এবং নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।এটি ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ সঙ্গত। ইসলামের ইতিহাসে এই ব্যাপারে কোনদিনই কোন দ্বিমত দেখা দেয় নাই কারণ মূলত ইহা দুই ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যে একপ্রকারের স্বেচ্ছামূলক চুক্তি বিশেষ। এক ব্যক্তি পুঁজি সংগ্রহ করে অপরজনতা হতে নিজের শ্রম মেহনত কর্ম ক্ষমতা সংগঠন প্রতিভা প্রয়োগ করে তা হইতে মুনাফা লাভ করিবার অধিকারী। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যবসায় যত শোষন ও জুলুমের অবকাশ থাকে ইসলামী সমাজে তাহার কোন সুযোগই থাকিতে পারে না। কাজেই ইসলামী সমাজে এরূপ ব্যবসা নাজায়েজ হওয়ার আর কোনো কারন ই নাই।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মূলধন বিহীন কোটি কোটি লোক নিছক মজুরির বিনিময়ে কাজ করিতেছে। ইহারা অসহায় দিনমজুর মাত্র অপরের প্রতিষ্ঠানের প্রতি মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ফলে একদিকে যেমন সকল শ্রমিকের কাজ করার সুযোগ পায় না বেকার সমস্যার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে অপরদিকে যাহারা কোন কোন কারখানায় নিযুক্ত হয় নিজেদের সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়। এই দিক দিয়া অংশীদারিত্বে ব্যাবসা লাভজনক।স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে এবং মুনাফা নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিয়া নিজের প্রয়োজন পূরণ করিতে সমর্থ হয়। মূলধন বিনিয়োগের এই পন্থার শ্রমিক মালিকের অধিকার পূর্ব হইতেনির্ধারিত হইয়া থাকে। শ্রমিক নিজের শ্রমের বিনিময় মজুরি লাভ করিতে পারিবে। একজন মূলধন দিবে অপরজন উহা লইয়া ব্যাবসা ও বানিজ্য করিবে এবং মুনাফার পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী অংশগ্রহণ করিবে।

যৌথ কারবার :

যৌথ কারবার মূলধন বিনিয়োগের এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুনিয়ার মানব সমাজে চিরদিনই এই যৌথ কারবার প্রচলিত ছিল। বিরাট কোন ব্যবসা বা শিল্প কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম মূলধন সঞ্চয় করা এক ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় সম্ভব নাও হইতে পারে। মিলিত পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক মিলনে এইটা সম্পন্ন করা খুবই সঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়। ই হাতে একাধিক লোক মিলিত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং সকলেই লাভ লোকসানের অংশীদার হয়। এরূপ ব্যবসা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে বিধিসম্মত।

ইসলামী অর্থনীতিতে, অর্থোৎপাদনের জন্য যে কোন সৎ ব্যবসায় কেন তাহাতে যদি লভ্যাংশ কাহারো জন্য পূর্বর হইতে নির্দিষ্ট না হয় যে তাহাকে শতকরা এত টাকা মুনাফা দেওয়া হইবে তাতে ইসলামী অর্থনীতি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণরূপে

জায়েজ। নিতান্ত নির্বুদ্ধিন্তার দরুন এই হালাল উপার্জনকে জাতীয় পুনর্গঠনমূলক এই সৎ ব্যবসায়কে একটু সামান্য কারণে হারাম করিয়ে তুলিয়াছে। অসংখ্য লোকের পুজি মিলিত হইয়া বিশেষ কোনো কাজ নিয়ত হইলেই যে তাহাতে মুনাফা হইবে এবং পূর্বনির্দিষ্ট হলে তাহা বন্টন করা যাইবে এ কথা কোন কালের কোন দেশের মানুষই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।

ব্যবসায়ী মাত্রই কিয়ামতের দিন অপরাধী হিসেবে পুনরুত্থিত হইবে। তবে তাহারা নয় যাহারা ব্যবসায়ী কার্যে আল্লাহকে পূর্ণমাত্রায় ভয় করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট জনগণের প্রতি কল্যাণপূর্ন ব্যবহার এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা রক্ষা করিয়াছে।

শ্রম, শ্রমিক ও মজুরি সমস্যা :

শ্রমিকের মর্যাদা :

শ্রম ও শ্রমিকের প্রথম সমস্যা হল তাহাদের সামাজিক মর্যাদা। বর্তমানের বিজ্ঞান উজ্জ্বল শিক্ষিত সমাজেও শ্রম করা নিতান্ত অপমানকর কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে শ্রমিক দিককে সাধারণত কোনরূপ সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাহাদেরকে ঘৃণিত লাঞ্ছিত বলিয়া মনে করা হয়। ইসলাম সর্বপ্রথম কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ ও সামাজিক বৈষম্যের উপর চরম আঘাত হানিয়েছে। ইসলাম মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ শুধু জাগ্রত করে নাই কার্যকর ভাবে শ্রমজীবী ও মজুরদের সম্মান ও মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কাজে ও হালাল পথে শ্রম এবং হারভাঙ্গা খাটনি খাটিয়াও জীবিকা উপার্জন করা কিছু মাত্র লজ্জার ব্যাপার নহে। তাহা করিলে কাহাকেও সামাজিকতার দিক দিয়ে মর্যাদাহীন প্রতিপন্ন হইতে হয় না। ইসলামের প্রত্যেক নবী দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া দ্বীনি গ্রন্থাবলীতে বলিষ্ঠ

কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ এই উপার্জনের জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিয়াছে।

মজুরি সমস্যা :

মজুরের পক্ষে এই মজুরি লাভই হইতেছে জীবন ধারনের একমাত্র উপায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত মজুররা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ঠিক মধুমক্ষীকার ন্যায়।নিঃশব্দ আঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, বুকের রক্ত পানি হয়ে যায় কিন্তু ইহার পরও যদি তাহাদের বাচিবার জন্য অপরিহার্য পরিমাণ মজুরি তাহারা লাভ হইতে না পারে, যদি তাহাদের কর্ম ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি খাটিতে হয়, যদি তাহাদের স্বাস্থ্য চিরতরে ভাঙ্গিয়া পরে, যদি কোন অঙ্গহানি ঘটে সারা দিনের শ্রম মেহনতের পর সন্ধ্যা কালে আশ্রয় লইবার মতো হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার মত উন্মুক্ত বায়ু সম্মৃবলিত কোন ঘরবাড়ি যদি তারা না পায়, রোগ ব্যাধি হইলে যদি উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা না হয়, যদি তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দীক্ষা ও লালন পালনের সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের আর অবধি থাকে না। তারা স্বাধীন মানুষের মতো মেরুদন্ড খাড়া হইতে ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে কোন দিনই সমর্থ্য হয় না। বস্তুত ইহাই বর্তমান দুনিয়ার শ্রমিক মজুরদের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। কেবল পুঁজিবাদী সমাজে বর্তমান আছে তাহা নয় সোভিয়েত দুনিয়ার শ্রমিকদেরও ইহাই প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যার একটিও কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নাই না সোভিয়েত দুনিয়ায়, না কোন পুঁজিবাদী দেশে ।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়েছে। এমনকি অর্থনীতির দুনিয়ায় এই সমস্যাবলীর ন্যায় সঙ্গত ও স্বভাবসম্মত সমাধান করার কৃতিত্ব একমাত্র ইসলামেরই প্রাপ্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হইতে নিম্নলিখিত মূলনীতি সমূহ আমরা জানতে পারি :

১. মালিক ও পুজিদার মজুর ও শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করিবে দুই সহোদার ভাইয়ের মধ্যে যেমন মৌলিক কোন পার্থক্য থাকে না এবং যেরূপ সম্পর্ক ও বর্তমান থাকে বা থাকা উচিত তাহাদের সহিত অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিবে।

২. খাওয়া পড়া থাকা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মান মালিক ও শ্রমিকের উভয়েরই সমান হইতে হইবে।মালিক ও পুজিদার নিজে যা খাইবে পড়িবে মজুর শ্রমিককে তাহাই খাইতে পড়িতে দিবার ব্যবস্থা করিবে। কিংবা অনুরূপ মানের পরিমাণ অর্থ মজুরি স্বরূপ দান করিবে।

৩.সময় এবং কাজ উভয় দিক দিয়েই সাধ্যাতীত পরিমাণ দায়িত্ব মজুরের উপর চাপানো যাইতে পারে না। কারো সাধ্যাত্তীত মাত্রার কিছু নয়, এমন কাজ নয় যাহাতে মজুর ও শ্রমিক শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একাধারে মেহনত করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না যাহা করিতে শ্রমিক অক্ষম হইয়া পড়ে। বস্তুত সময় এবং মজুরি লইয়া মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বর্তমান পৃথিবীকে বিড়ম্বিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে তাহার সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মতাদর্শী করিতে পারেনা।

৪.যে কাজ করা শ্রমিক এর যেন অসাধ্য সে কাজে তাকে সাহায্য করিতে হইবে।

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল তাহাকে বিশেষ আন্তরিকতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হইবে এবং কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় পুরোপুরি কাজের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করিতে হইবে। কাজে অমনোযোগিতা বা অপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন কিংবা কাজ না করিয়া যেন প্রকার নির্দিষ্ট সময় কাটাইয়া দেওয়া ইসলামের শ্রম আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হয়েছে। এরূপ করা হইলে তাতে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হইবে এবং এজন্য তাকে আল্লাহর নিকট দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। যখন সে একটি কাজের জন্য দায়িত্বশীল হইয়াছে তখন সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিতে তাহার প্রতি এই আশা পোষণ করা হয় যে সে পূর্ন সততা ও বিশ্বাস পরায়নতা সহকারে শ্রম করিবে ও দায়িত্ব পালন করিবে।

শ্রমিকদের অধিকার :

শ্রমিকদের নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার ও ইসলাম স্বীকৃত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস হইতে ইহা প্রমাণিত। তিনি বলিয়াছেন -

“তোমার নিজের উপর তোমার একটা অধিকার আছে।তোমার দেহের একটা অধিকার আছে তোমার উপর। তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে তোমার উপর। তোমার চক্ষুরও অধিকার রয়েছে তোমার উপর “

এই অধিকার আদায় করিতে বাধ্য প্রত্যেকটি মানুষ। অতএব তাহারা যাতে অধিকার গুলির সঠিকভাবে আদায় করিতে পারে এই দায়িত্বসমূহ পুরাপুরিভাবে পালন করিতে সমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকিতেই হইবে।শ্রমিক মজুরদের জন্য ছুটি অবসর যাপনের যথেষ্ট সময় থাকিতে হইবে। যেন তাহারাই অধিকারসহ যথারীতি আদায় করতে সক্ষম হয়। যে শ্রম নীতি শ্রমিকদের জন্য এইরূপ সুযোগ-সুবিধার

ব্যবস্থা করে না তাহা ইসলামী অর্থনীতি সম্মত নীতি হইতে পারে না। উহাকে মানুষের উপযোগী অর্থনীতি ও মনে করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে পার্থক্য :

সোভিয়েতরাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা :

ইসলামী অর্থনীতি মজুর শ্রমিকদেরকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকারও দেয়। সুযোগ সুবিধা দান করে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা প্রকাশ করা এবং সরকারি অব্যাবস্থার সমালোচনা করারও অধিকার দেয়। সোভিয়েত রাশিয়ার ছায়ার তলে শ্রমিকদের জীবন বড়ই দুঃসহ, অবস্থা অতিশয় মর্মান্তিক। শ্রমিক মজুর ও চাষীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এক কাজ করিয়া অন্য কাজ গ্রহণ করার কোন অধিকার ও তাহাদেরকে দেওয়া হয় নাই। তাহা করিলে ২৬ শে জুন ১৯৪০ সালের গৃহীত একটি আইন অনুযায়ী তাহাকে চার মাসের কারাদন্ড বদন্ডিত করা হয়। সামরিক রেলওয়ে এবং পানি সরবরাহকারী বিভাগ সমূহের মজুরগণ বিনা অনুমতিতে কাজ পরিবর্তন করিলে তাহাকে ৫ হইতে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। কোন মজুর যদি এক মাসে তিনবার কিংবা দুই মাসে চারবার কাজে বিশ মিনিট সময় দেরি করিয়া আসে তো আইনের বলে তাহাকে সেই স্থানই ছয় মাস কালের শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হয় এবং এক চতুর্থাংশ বেতন কাটিয়া লওয়া হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার মজুরগণ সরকারের হস্তে নিষ্প্রাণ কাঁচামালের মতোই ব্যবহৃত হয়। সেখানে মজুরের বাসস্থানের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ইচ্ছামতই যেখানে সেখানে মজুর কে বদলি করা হয় এবং উপস্থিত হইয়া কাজে নিযুক্ত হইতে মজুর কে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু এইরূপ রাষ্ট্রের নির্মম অক্টোপাসে বাধা কলুর বলদ মজুর শ্রমিকগণ সেখানে কিরূপ মজুরি পাইয়া থাকে? ইহার উত্তরে শোনা যায়,তাহা হইতেছে দুই দুইশ, চার -চারশ রুবল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন মজুর হয়তো মাত্র ১০.১ রুবলেরও কম অন্য একজন ১১০০.১ রুবলেরও বেশি বেতন পাইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে রুবলের আন্তর্জাতিক মূল্য বাংলাদেশী টাকার অপেক্ষাও অনেক কম। আর দেশের অভ্যন্তরে ক্রয় ক্ষমতা আরও অনেক কম। উদাহরণস্বরপ বলা যায়, রাশিয়ার একজন মজুর কে এক কিলোগ্রাম পরিমাণ মাখন খরিদ করার জন্য যেখানে ২৩ ঘন্টা ৩ মিনিটের অর্থাৎ তিন দিনের শ্রম উপার্জিত অর্থের আবশ্যক সেখানে একজন ইংরেজ মজুর মাত্র এক ঘন্টা ১৩ মিনিটের মজুরি দ্বারাই অত পরিমাণ মাখন খরিদ করতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক :

বর্তমান সময় বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রয়োজনশীল লোকদেরকে সুদের বিনিময়ে ঋনদান এর কাজ করিতেছে। এই ঋণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ন করার জন্য পাওয়া যাইতেছে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য ও। এইরুপ ঋণদানে অভাবগ্রস্থ লোকদের আপাত দৃষ্টিতে যথেষ্ট উপকার হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বিরাট বিরাট বাণিজ্য ও কারখানা এই ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত মূলধনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং চলিতেছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজকে একটি বিরাট ও কঠিন বিপর্যয়ের মুখে ফেলিয়া দিতেছে। ইহার দরুন সমাজের বুনিয়াদ চূর্নবিচূর্ন হইয়া যাইতেছে। শোষণ পীড়নের প্রচন্ডতায় মানব সমাজের একাংশ নিঃস্ব ও সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে, আর অপর অংশ যাদের সংখ্যা শতকরা ১০ জনেরও কম হইয়া থাকে তাহারা কোটিপতি ও পুজিপতি হইতেছে। মানব সমাজকে এই ধ্বংস থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হইলো বিনা সুদে ঋনদানের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে যে সুদি ব্যাংক ব্যবস্থা চালু আছে এই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হইবে।

সুদবিহীন ঋনদানের ব্যবস্থা ও ব্যাবসায় বিনিয়োগ করে আমানতদারকে লভ্যাংশ দিয়ে উপকার পৌছানো যাবে।বর্তমানে মানুষের ধারণা সুদ বিহীন ব্যাংক চালানো অসম্ভব। কিন্তু ইসলাম নিয়ে জানাশোনা থাকলে এবং গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায় যে সুধবিহীন অর্থনীতি শুধু সম্ভবই নয় এটা একটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। মানুষকে সকল ধ্বংসকারীতা হইতে রক্ষা করতে পারে, সমাজের বৈষম্য দূর করতে পারে। এখানে আমরা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালনা করা যাবে তা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার রূপ:

ব্যাংক আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশেষ অবদান। ব্যাংকের বর্তমান রূপ পুঁজিবাদীদের শোষণ পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ার। ব্যাংকে সাধারণত দুই প্রকারের পুঁজি সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথমত, অংশীদারদের দেওয়া পুঁজি এবং দ্বিতীয়তঃ ধনীদের আমানত স্বরূপ প্রদত্ত টাকা। আমানতস্বরূপ রক্ষিত টাকা ৩ প্রকার। প্রথম যাহা চাওয়া মাত্রই ফিরাইয়া পাওয়া যায় যাহাকে বলা হয় কারেন্ট ডিপোজিট। দ্বিতীয় যাহা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের নিকট অর্পণ করা হয় ইহাকে বলা হয় ফিক্সড ডিপোজিট। এবং তৃতীয় হইতেছে সেভিংস ডিপোজিট সপ্তাহে একবার ইহার এক তৃতীয়াংশ ফিরাইয়া লওয়া যায়। ব্যাংক সংগৃহীত পুঁজির একাংশ নিজের নিকট সংরক্ষিত পুঁজি হিসাবে সব সময়ের জন্য জমা রাখিয়া দেয়। উহার নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন উহা হইতেই পূর্ণ করা হয়। ইহার পর কিছু পরিমাণ পুঁজি বাজারে ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। এই পুঁজি ও নগদ রিজার্ভ টাকার ন্যায় সকল সময়ই আদায়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে। এই পুঁজিতে শতকরা এক হইতে ১ টাকা পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। ব্যাংক পুঁজির একাংশ হুনডির কারবারে এবং অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করে থাকে।এই পুঁজি ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরাইয়া পাওয়ার যোগ্য বলিয়া ইহাতেও সুদের পরিমাণ খুবই সামান্য। অতঃপর ব্যাংক পুজির একটি বিরাট অংশ এমন সব কাজে লগ্নি করে যাহাতে পুজির নিরাপত্তা সম্পর্কে অপেক্ষা কৃত অধিক নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে তাহা বিক্রয় করিয়াও মূল পুঁজি উদ্ধার করা যায়। এইরূপ অর্থ

বিনিয়োগে শতকরা দুই থেকে চার টাকা সুদ ও পাওয়া যায়। সরকারি সিকিউরিটি এবং কোম্পানির অংশ ও ডিবেন্চার্স ইত্যাদি এই শ্রেণীতেই পড়ে। নগদ রিজার্ভ পুঁজির পর ব্যাংক এইসব ক্ষেত্রেও পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকে। কারণ ব্যাংকের আত্নরক্ষা ও স্থিতিস্থাপনের জন্য ইহা অপরিহার্য। ইহার ফলেই ব্যাংকের মেরুদণ্ড অধিকতর দৃঢ় হয়। বিপদের সময় ইহা উহার পৃষ্ঠ পোষক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

ব্যাংক পুজির সর্ব প্রধান অংশ নিয়োগ করা হয় কারবারি ও ব্যবসায়ী লোকদেরকে এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত ঋণ বাবদ। বস্তুত ব্যাংকের আমদানির সর্ব প্রধান উপায় ইহাই।এই ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা উচ্চ হারে সুদ লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেকটি ব্যাংকেই নিজ পুঁজির প্রধান অংশ ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকারবারে বিনিয়োগ করিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক ব্যাংকেই সাধারণত শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজি এই কাজেই বিনিয়োগ করিয়া থাকে।

মোটকথা, ব্যাংক আমানতদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং নিজেদের লগ্নিকৃত পুঁজি যত ভাবেই বিনিয়োগ ও ব্যয় করে তাহা সবই সুদের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। বস্তুত এই সুদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানীয় সমাজের জনগণের নিকট হইতেই আদায় করা হয় এবং তাহাদের শ্রমার্জিত অর্থ সুদ বাবদ শোষিত হইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুজিপতিরননিকট পুঞ্জিভূত হয় । আমানতকারিগণ সুদ   বাবদ যাহা পায় ঋণ বাবদ লগ্নিকৃত অর্থের নির্দিষ্ট হারে আদায়কৃত সুদেরই অংশ মাত্র। ঋণ গ্রহণকারীদের নিকট হইতে ব্যাংক উচ্চ হাড়ে সুদ আদায় করে এবং আমানতকারীদিগকে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত কম হার সুদ দেয়। এইভাবে ব্যাংকের ভাগের সুদের অবশিষ্ট অংশ হইতে ব্যাংকের যাবতীয় খরচ বহন করা হয় এবং তাহার পরও যা বাকি থাকে তাহাই ব্যাংক ব্যবসায়ের মূল অংশীদারদের মধ্যে ঠিক সেই নিয়েমই বন্টন করা হয় যেমন অংশীদার ভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের লভ্যাংশ বন্টন করা হয় উহার অংশীদারদের মধ্যে।

বস্তুত ব্যাংক ছোট বড় যত কাজই করে সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানোই হইল উহার আসল ও প্রধান কাজ। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসা করে না, ব্যবসায়ীদের জন্য সুদের বিনিময়ে পূজি জোগাড় করাই উহার কাজ। ব্যাংক নিজে কোন কারখানা খোলে না বরং শিল্প উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপনকারী লোকদের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ আদায় করা উহার কাজ।

এক্সেনজ ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণত বৈদেশিক পণ্য বা পুজি বিনিময়ের কাজ করিয়া থাকে। এইরূপ এক্সচেঞ্জের কাজ করিয়া ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন লাভ করিয়া থাকে। এছাড়াও মন্দির বিনিময়ে এল সি খোলার মাধ্যমেও সুদ লইয়া থাকে।

ব্যাংক সম্পর্কে বলা যায় যে এর সকল কাজ দ্বারা মানুষের অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হয়। তবুও ব্যাংকের কাজ এই কারণে বিতর্কিত যে এটি আগাগোড়া সুদের ওপর দন্ডায়মান। যদি এই সুদ বন্ধ করিয়া ব্যাংকের কাজ চলমান রাখা যায় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর হইবে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রটি সমূহ :

ব্যাংকের এতদসকল কল্যাণকর কাজের পরেও তার মধ্যে ক্রটি রহিয়া গিয়াছে। যেমন-

ব্যাংকের মাধ্যমে অসংখ্য হাতে বিক্ষিপ্ত পুঁজি এক কেন্দ্রিক হইয়া তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজি পতির একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে। ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ব্যাংক পরিচালকরা এই পুঁজি জাতীয় স্বার্থের বিপরীত কাজে

দেশবাসীর নিকট অবশিষ্ট ধন-সম্পদ নিঃশেষে লুটিয়া লইবার জন্য ব্যবহার করে। সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা যে সমাজে স্থাপিত হয় তথায় মুষ্টিমেয় পুঁজি পতিদের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত না হইয়া পারেনা। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুজির হাতেই কুক্ষিগত হয়। আর মুষ্টিমেয় ধনীকরা ই হয় সেখানে পুঁজির একচ্ছত্র মালিক।

দ্বিতীয় সমস্যা হল এই সকল ব্যাংকে অসংখ্য লোক টাকা রাখে ঠিক,রাখার পর তাদের টাকা কোথায় যায় কে নেয় কি করে এসব তাদের কোন খবর নাই।কারন তাতে তাদের লাভ লোকসান নাই।তারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়।ব্যাবসায় টাকা বেশি লাভ হলেও তাদের কোন লাভ নাই আর লোকসান হলেও লোকসান নাই।তাই দেশের টাকা আমানতকারীরা কোন খোজ ই রাখেননা যে তার টাকা দিয়ে বেশি উৎপাদন হচ্ছে না কম হচ্ছে। এতে করে এটা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি।কারন টাকা আমানতকারীরা তাদের টাকার ব্যাবহারের কোন খোজ নেননা।যার কারনে টাকা বেশি উৎপাদনমুখী হয়না।

ইসলামী ব্যাংক:

ইসলামী অর্থনীতি আধুনিক ব্যাংকের মূল ভিত্তিকেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উহাকে নূতনভাবে গঠন করার নির্দেশ দেয়।এইজন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল বিনা সুদের ব্যাংক ব্যাবস্থার প্রতিষ্ঠা।

ইসলামী ব্যাংকের স্বরূপ হবে - ব্যাংকে জনগণের টাকা আমানতস্বরূপ রাখা হইবে। কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র সুদ দেওয়া বা লওয়া হইবে না। আমানতদারদের অনুমতি ক্রমে তাহার টাকা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হইলে ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ সে নিশ্চয়ই পাইতে পারিবে। অন্যথায় তাহা শুধু আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা হইবে। উপরন্তু প্রতিবছর তাহা হইতে অনিবার্যরূপে যাকাত

আদায় করা হইবে। ব্যাংকের খরচ বাবদ কিছু কমিশনও উক্ত টাকা হইতে কাটা হইবে।

যখন কেহ কোন শিল্প কারখানা বা লাভজনক বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলিতে চাহিবে তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণপরিকল্পনা ও এস্টিমেট ব্যাংকের নিকট পেশ করবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পনাটি গভীরভাবে পরীক্ষা ও সর্বতভাবে যাচাই করিয়া দেখার পরে ইহা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হইলে ব্যাংক এর পক্ষ হইতে মূলধন মালিকদের নিকট সাধারণভাবে উহা পেশ করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের জন্য আবেদন করবে।তখন দেশের মূলধন মালিকগণ অর্থ বিনিয়োগের একটি নির্ভরযোগ্য সুযোগ মনে করিয়া সে সম্পর্কে উৎসাহিত না হইয়া পারিবে না। অন্যথায় প্রত্যেকের নিকট জমাকৃত অর্থ বেকার বসিয়া থাকিবে এবং প্রতিবছর যাকাত আদায় করিয়া তাহার মূলধন কমিতে থাকিবে। অতএব এই আবেদনে প্রচুর পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে সুদ ভিত্তিক ব্যাংক সমূহ যত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে ইহার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম হইবার সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু যাহারা সুদের কারণে ব্যাংকে টাকা রাখিতো না তারাও ব্যাংকে টাকা জমা রাখিবে বিনিয়োগের লোভে।

এছাড়াও উপরোক্ত পন্থায় সংগৃহীত মূলধন দ্বারা যে শিল্প কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে ব্যক্তিগতভাবে কোন লোক বা কোন ব্যাংক উহার মালিক হইবে না। উহার মালিক হইবে মূলধনদাতা পুজি মালিকগণ। উহার লাভ ক্ষতি ভালো মন্দ সুনাম ও দুর্নামের সহিত প্রত্যেক অংশীদারের নিবিড় যোগাযোগ থাকিবে বলিয়াই এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি লোকই সচেতন থাকিবে। এই উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কারখানায় উৎপাদন বিন্দুমাত্র নিকৃষ্ট হইলে তখনই উহার প্রতিবিধান ও সংশোধন করিতে প্রত্যেক অংশীদারই সচেষ্ট হইবে। কারখানার পরিচালক দিগকে সতর্ক করিয়া উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদনের নির্দেশ দিতে একটুও বিলম্ব করিবে না। কারণ কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হওয়ার সহিত তাহার স্বার্থ জড়িত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইসলামী সমাজের শিল্প কারখানাসমূহ বিপুল

সংখ্যক লোকের আন্তরিক শুভেচ্ছা পারস্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। যাহা পুঁজিবাদী ব্যাংকের কারণে সম্ভব নয়। কারণ এখানে কারখানা পরিচালকদিগের কোন জবাবদিহিতা নাই। যাহাদের মূলধন তাদেরই কোন অংশীদারিত্ব নাই। এভাবে প্রত্যেকের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা বর্তমান থাকার দরুণ জাতীয় অর্থনীতির অব্যাহতভাবে উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হইবে।

ইসলামী এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। সুদ মুক্ত এই ব্যাংক ব্যবস্থা "মুজারিবাত"নীতিতে এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান কায়েম করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্যকারী হইবে।ইহাতে শ্রম ও মূলধন পরস্পরের সহিত মুনাফার অংশীদার হিসেবে মিলিত হইবে। বস্তুত স্শ্রম ও মূলধনের স্থায়ী সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপারটিকে নৈতিক আদর্শ ও রীতিনীতি ভিত্তিতে স্থাপিত ও পরিচালিত করা সম্ভব হইবে। উভয় পক্ষের নৈতিক দায়িত্ব কে উভয়ের ঈমানের অংশ রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে ফলে মুজারিবাতের নীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন ইউনিটে শরীকদারিতে সকল প্রকার কৃষি ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে।

ব্যাংক ও ব্যবসায়ীদের একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নাই। মিশরে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবসায় বিগত কয়েক বছর পূর্ব হইতে বিশেষ সাফল্য সহকারে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা ক্রমশ বিকাশ ও অগ্রগতি লাভ করিতেছে। ইহা এই পর্যায়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ। করাচিতেও এই ধরনের একটি সুদ বিহীন মুনাফা ভিত্তিক ব্যাংক কায়েম করা হয়েছিল ;কিন্তু সরকারের অসহযোগিতার দরুন শেষ পর্যন্ত তাহা অচল হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহা মুদ্রা তৈরি, মূলধন সংগ্রহ ও সুদব বর্জন ছাড়াও সেই সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিত যাহা আধুনিক কালের কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সম্পন্ন করিয়া থাকে। বর্তমান

দুনিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বায়তুল মাল কায়েম এর মাধ্যমে যাবতীয় কর্তব্য ও তৎপরতাকে সমন্বিত করা যাইতে পারে। এই ব্যাংক সকল প্রকার সুদি কারবারকে সহজেই এড়াইয়া চলতে পারে। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র সমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উদ্যোগী হইলে মুসলিম জাহান হইতে কেবল যে সুদকে চিরতরে উৎপাটিত করা যাইবে তাহাই নয়, উহা দ্বারা মুসলিম তথা সাধারণ জনমানুষের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক :

ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক পুঁজিবিনিময় এর কাজও সুস্ঠ রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে। এইজন্য উহাকে হয়তো এমন এক মুদ্রানীতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহার ফলে উহার মুদ্রা সরাসরি ভাবে সকল দেশেই বিশেষ করিয়া শিল্প প্রধান দেশসমূহে অবাধে চলিতে পারিবে।

এইরূপ নীতি অবলম্বন একান্তই অসম্ভব হইলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও শিল্পপ্রধান দেশে (প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সঙ্গে) ইসলামী ব্যাংকের একটি ক্ষুদ্রায়তন শাখা খুলিয়া দিবে। এই ব্যাংক ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রকার বৈদেশিক প্রয়োজন পূর্ণ করিবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন ব্যবসায়ী ফার্ম বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করিতে চাহিলে সে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পণ্যমূল্য আদায় করিবে। ব্যাংক নির্দিষ্ট দেশের শাখা ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ফার্মে উক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেওয়ার নির্দেশ পাঠাইবে। কিন্তু এইজন্য কোন প্রকার সুদ গ্রহণ করিতে পারিবে না; যদিও খরচ বাবদ নির্দিষ্ট কমিশন আদায় করা ব্যাংকের পক্ষে অসংগত হইবে না।

সর্বোপরি বিবেচ্য বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে কোন দেশের অভ্যন্তরেও যদি সুদবিহীন ব্যাংক একবার স্থাপিত এবং সঠিক কাজ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার অনস্বীকার্য নৈতিক প্রভাব স্থাপিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখন আন্তর্জাতিক বিনিময় কার্যও বিনাসুদে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইসলামী ব্যাংকের পরিকল্পনা

আমরা এখানে একটি ইসলামী ব্যাংক গঠন ও সেজন্য কাজ শুরু করার বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। প্রসংগত একটা চালু ব্যাংকের কার্যদ্বারা কি হইবে এবং ইসলামী আদর্শের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উহা কিভাবে আধুনিক ব্যাংকের সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে, তাহাও বিশ্লেষন করিতে চেষ্টিতে হইব।

বস্তুত ঈমানদার মুসলমানরা যখন জানিতে পারে যে, Interest এবং usury উভয়টিই ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম, তখন তাহাদের মনে এই প্রশ্ন তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠে ত যে, ইহা ছাড়া এ যুগে ব্যাংক চলিতে পারে কিভাবে? তখন তাহারা এই দুইটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক সংগীত ও চালু করা যায় কিনা তাহা চিন্তা করিতে শুরু করিতে পারে। তখন তাহারা মুনাফা ও শরীকদারীর ভিত্তিতে ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যে একটি promoters company গঠন করিয়া অংশীদার হইতে ইচ্ছুক লোকদের প্রতি share capital সংগ্রহ করিবার আবেদন প্রচার করিতে পারে।

পরে জনগণের নিকট হইতে বাবসায়ের অংশীদার হিসাবে যেসব subscription পাওয়া যাইবে। তাহাতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা share certificate দিয়া দিবে। ফলে ইহারা প্রত্যেকেই মূল ব্যাংক ব্যবসায়ের অংশীদার রূপে গণ্য হইবে। এই অংশীদাররা নিজেদের একটি অধিবেশনে বোঁড অব ডাইরেকটরস (Board

of directors) নির্বাচন করিবে এবং এই ডাইরেকটরস বোর্ড ব্যাংকের কর্মচারী নিয়োগ করিবে। ডাইরেকটরস্ বোর্ড ব্যাংক পরিচালনার নীতি (policy) নির্ধারণ করিবে এবং দায়িত্বশীল কর্মচারীরা সেই নীতি অনুযায়ী ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিবে।

বর্তমান সময়ে ব্যাংকের অংশীদাররা নির্দিষ্ট হারে dividend পাইয়া থাকে, কোন কোন ব্যাংক আবার অংশীদারদের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের হিসাবান্তে অর্জিত মুনাফা (profit) বন্টন করিয়া থাকে। ইসলাম যেহেতু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবসায় ও মূলধন বিনিয়োগ সমর্থন করে, তাই প্রস্তাবিত ব্যাংকে অংশীদাররাও একটির আর্থিক বছর শেষান্তে নিজ নিজ অংশের মুকাবিলায় আনুপাতিক dividends পাইতে পারে।

ব্যাংকে অর্থ জমাকারীদের অবস্থা:-

এইভাবে ব্যাংক কাজ শুরু করিয়া দিলে জনগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা ইহাতে জমা দিতে শুরু করিবে। ব্যাংক এমন সব জমাও গ্রহণ করিবে যাহা পূর্ব অবগতি ব্যতীত ফেরত চাওয়া যাইবে।

এই জমাকে পরিভাষায় বলা হয় demand deposists। এই টাকা ব্যাংকে রাখা হয় শুধু সংরক্ষণ ও হেফাজত লাভের উদ্দেশ্যে। ব্যাংক তাহাদের নামে হিসাব খুলিয়া দিবে এবং চাহিদা অনুযায়ী লেন-দেন করিবে। এইরূপ জমায় ব্যাংক জমাকরীদের নিকট হইতে service charge আদায় করিতে পারিবে।

ব্যাংকে কেবল এই ধরনের টাকাই জমা করা হয় না; সেই সঙ্গে এমন বহু টাকাও জমা করা হয় যাহা দীর্ঘ মেয়াদী এবং কোনরূপ পূর্ব অবগতি ব্যতীত কখনও ফেরত চাওয়া হয় না; এইরূপ টাকার পরিমাণই বেশী হইয়া থাকে।। তখন ব্যাংক এই টাকা cerified deposits হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে

deposit certificates ইস্যু করিবে। এইসব সার্টিফিকেট তিন মাস হইতে ১২ মাসের জন্য ইস্যু করা যাইতে পারে। এই জমাকারীরা কোন service charge দিবে না। বরং তাহারা ব্যাংকের আর্থিক বৎসরান্তে আনুপাতিক মুনাফা লাভ করিতে পারিবে। ইহাও dividends রূপে দেওয়া যাইবে।

বিনিয়োগকারীদের অবস্থা:

ইসলামী ব্যাংক মূলধন সংগ্রহের জন্য dedentures ইস্যু করিবে না। কেননা তাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণের মুনাফা দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়। ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন পাওয়ার জন্য জনগণকে নির্দিষ্ট মেয়াদ কিংবা নির্দিষ্ট উৎপাদনী কাজে মুনাফা ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের আহাবান জানাইত পারে। ব্যাংক এইসব কাজ হইতে লব্ধ মুনাফার অংশ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তাহাদের মূলধন অনুপাতে ভাগ করিয়া দিবে। ইহাদের নামে বিনিয়োগ সনদ (investment certificate) দেওয়া যাইবে এবং ইহা এক বৎসর হইতে পাচ বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারিবে।

সমাজে এমন বহুলোক রহিয়াছে যাহারা নিজেদের উদ্বৃত্ত মূলধন সংরক্ষণ ও মুনাফামূলক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার উপায় সন্ধান করিতেছে। ইসলামী ব্যাংক যেহেতু জনগণের নিকট খুবই বিশ্বাস্য ও আস্থাভাজন হইবে, তাই ইহা এই শ্রেণীর লোকদের মূলধন রাখা ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যম বিবেচিত হইতে পারিবে। ফলে ব্যাংক এইসব মূলধন পাইয়া উহার সুষ্ঠু ব্যবহার ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লোকদের বিরাট কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং সেই সংগে এ ধরনের অবশিষ্ট আরও বহু লোকের নিকটও আস্থাভাজন হইয়া তাহাদেরও মূল্যধন গ্রহণের বিপুল সুয়োগ পাইতে পারে; ব্যাংক এই ব্যক্তিদের নামে investment certificate ইস্যু করিতে পারে। ইহা দীর্ঘ মেয়েদী কিংবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইতে পারে, হইতে পারে ৫বা ১০ বৎসরের মেয়াদের জন্যও। এই সনদধারী লোকেরা ব্যাংকের মূল মুনাফার আনুপাতিক অংশীদার হইবে। অবশ্য সময় ও

অন্যান্য কার্য-কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল অংশীদার এবং আমনতকারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফার হার বন্টন করিতে হইবে।

ব্যাংকের মূলধন সংগ্রহের জন্য ইহা খুবই কার্যকর ও বাস্তব পন্থা বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন ব্যাংক এই পন্থাকে কাজে লাগাইয়াছে এবং এই উপায়ে তাহারা বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে Investment certificates কিংবা Investment bonds জারী করা হয় এবং তাহা করা হয় নির্দিষ্ট রেটের rate সুদের (Interest) ভিত্তিতে।

বর্তমান যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঋণ বা অগ্রিম মূলধন পাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক। কয়েকটি অত্যুন্নত দেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সর্বাধিক কল্যাণকর প্রমাণিত হইয়াছে। সেই সব দেশে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গিয়াছে। কাজেই ইসলামী রাষ্টেও ব্যাংকের মাধ্যেমে এই সুবিধা (facilities) ও সুযোগ জনগণের জন্য নিশ্চিয় করিতে হইবে। দেশের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে এই cresit facelities সম্প্রসারিত হইলে অধিক কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ বিশেষ জরুরী এবং ইসলামী ব্যাংককে এ কাজ অবশ্যই করিতে হইবে।

ইসলাম নির্দিষ্ট মুনাফা (Interest, usury) - (সুদ) হারাম করিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অগ্রিম ভিত্তিতে ব্যবসায় বা শিল্পে অর্থবিনিয়োগেরও নিষেধ করিয়াছে। ইসলামে সর্বপ্রকার অর্থ বিনিয়োগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। মুনাফা হইলে উভয় পক্ষই তাহা পাইবে এবং লোকসান হইলে উভয়ই তাহার বোঝা বহন করিবে। মন্দা অবস্থার ঝুঁকি কেবল একটি পক্ষের উপর চাপাইয়া দেওয়া কোনদিক দিয়াই সংগত হইতে পারে না।

অংশীদারদের অংশের টাকা আমানতকারী জমা এবং বিনিয়োগকারীদের দেওয়া মূলধন হস্তগত হওয়া এবং ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ ও ইহার সহিত যোগ হওয়ার পর কোন নির্ভরযোগ্য মুনাফা-সম্ভব শিল্প কর্মে তাহা লগ্নি করিতে হইবে। এলাকার ব্যবসায় ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রয়োজন পূর্ণার্থেও ব্যাংক টাকা লাগাইতে পারে-ঠিক যেমন ব্যবসায়ী ব্যাংক (commercial bank) করিয়া থাকে

অতঃপর এখানে আমরা স্বল্প-মেয়েদী মূলধন বিনিয়োগ এবং তাহার পর দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

শিল্পকর্মে অর্থ বিনিয়োগ

শিল্পকর্মে অর্থবিনিয়োগ হইতে পারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট শিল্পে এই শর্তে অর্থবিনিযোগ করিবে যে, লাভ ও লোকসান ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হইবে।

একালের সাধারণ অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোন শিল্প কর্মে অর্থবিনিয়োগের প্রশ্ন দেখাদিলে উহার আর্থিক অবস্থা সর্বাত্মকভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষও পর্যালোচনার পর সংশ্লিষ্ট শিল্প অর্থবিনিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হইলে এবং ব্যাংকের মূলধন এখানে সংরক্ষিত থাকিবে মনে করা গেলে, তাহার পরই ব্যাংক অর্থবিনিয়োগে প্রস্তুত হইতে পারে। ইসলামী ব্যাংকও অনুরূফভাবে সর্বপ্রকার অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রকে পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিবে শুধু একটা ব্যাংক হিসাবেই নয়, বরং সম্ভাব্য অংশীদার হিসাবেই পরীক্ষা-কার্য সম্পন্ন করিবে এবং বিষয়টির প্রকৌশলী (Technical) দৃষ্টিতেও বিচার করিবে। এজন্য ব্যাংক যে Technical staff নিযুক্ত করিবে তাহা শিল্পকর্মেরও বিশেষ উপকারে আসিবে। ব্যাংক ইহার সাহায্যে যেমন প্রতিটি শিল্পকর্মের ব্যাপারে কার্যকর পরামর্শ দিতে পারিবে, তেমনি মূলধনসহ শিল্পকর্মের ব্যবসায়ের অবস্থার সহিত পূর্ণ সহযোগিতাও করিতে সমর্থ হইবে। পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়মিত

পরিদর্শনের (Regular inspection) মাধ্যমে স্বীয় মূলধনেরও সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

ব্যাংক ও শিল্পকর্মে মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লব্ধ মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টন করার একটা হার ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। আর পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে কাজ করিতে পারিবেঃ

(১) বিশেষ শিল্পকর্মে মূলধন (Working Capital) হিসাবে কাজ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক এ 'লোন' (Loan) মঞ্জুর করিবে। আমরা ইহাকে Bank investment বলিতে পারি (Short term financing) ।

(২) প্রস্তাবিত শিল্পকর্মে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের সমপরিমাণ মূলধন ব্যাংক দিতে পারে। কিংবা শিল্পকর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী আনুপাতিক হারেও মূলধন বিনিয়োগ কারা যাইতে পারে।

(৩) ব্যাংক শিল্পকর্ম পরিচালক কোম্পানী একটি অংশীদারিত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। ইহাতে কোম্পানীর বাবহার্য সম্পত্তির (assets) উপর ব্যাংকের আনুপাতিক মালিকানা স্বীকৃত হইবে। ফলে ব্যাংক যাহাতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে সেই সব শিল্পকর্মের উপর উহা আইনগত মালিকানার অধিকারী হইবে।

(৪) শিল্পকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মজুরী ও পরিচালনা বিভাগের বেতন ইত্যাদিতে যেমন পণ্যের উৎপাদন খরচায় (cost of prouction) গণ্য করা হয়, তেমন ব্যাংক উক্ত শিল্পকর্ম পরিদর্শন, উপদেশ দান এবং উহার হিসাব রক্ষর্থে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন বাবদ যাহা ব্যয় করিবে তাহাও যুক্তভাবে উৎপাদন খরচারূপ গণ্য হইতে পারিবে। অবশ্য মূল কাজ শুরু করার পূর্বে কৃতচুক্তিতে এইসব সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কার্য কাল (season) কিংবা আর্থিক বৎসর শেষ হইলে পর চূড়ান্ত মুনাফা বা লোকসান যাহা কিছুই হইবে তাহা আনুপাতিক হারে ব্যাংক ও শিল্প কোম্পানীর মধ্যে বন্টন করা হইবে।

(৬) ব্যাংকের দেওয়া loan ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা না হইলে সরকার কোর্টের বিচার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে একটি Trusteeship নিযুক্ত করিতে পারিবে। উহা ব্যবসায়টিকে নির্বিঘ্নে চালাইবে ও কম-সে-কম মেয়াদ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিব। উহাতে বর্তমান মুনাফা ও উদ্বৃত্ত সম্পত্তি (assets) এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে একদিকে ঋণ পরিশোধ হয় এবং অপর দিকে মূল ব্যবসায়টিও যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে। এইভাবে ব্যবসায় গুটানো এবং দেওলিয়া প্রাপ্তি (Bank ruptcy) কে সমূলে উৎখাত করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ইসলামী ব্যাংক 'মুদারিবা')مضاربت(ভিত্তিতে কোন শিল্প-পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। একটি অনুন্নত দেশে-যেখানে শ্রম খুবই সম্ভব পাওয়ার যায় এবং স্থানীয় মূলধন যেখানে অব্যবহৃত হইয়া বেকার পড়িয়া রহিয়াছে- মূলধন সংগ্রহ ব্যাপক কর্মবিনিয়োগ (employment) এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে এই পরিকল্পনা বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যে মুলধন বিনিয়োগ

শিল্পকর্মের ন্যায় ব্যবসায় ও বাণিজ্যেও অনুরূপ ভিত্তিতে মুলুন, বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায় মালিক মূলধন, সময়-কাল (period) এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। মূলধন বিনিয়োগ ও নিয়মিত পরীক্ষাকার্য সম্পাদনকে ব্যাংক পাশাপাশি ও সমান্তরালভাবে চালাইতে পারে। ব্যাংক বাজারের অবস্থা এবং মুনাফার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সময়

সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়া মূল ব্যবসায়টিকে সটিক পথে অগ্রসর করিয়া নিতে পারে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিবে। তাহা হইল, বাসায়ের bill of exchange-এ মূলধন নিয়োগে। বর্তমান সময়ে ব্যাংক bill of exchange- এর অগ্রিম বাটা (discount) কাটিয়া 'লোন' (Loan) মঞ্জুর করে ৩০,৬০ বা ৯০ দিনের জন্য। পাইকারী ব্যবসায়ীরা ও খুচরা বিক্রেতাদের অনুরূপ ভিত্তিতে 'ঋণ' দেয় এবং এ সুযোগের সম্প্রসারণ অনুপাতে নির্দিষ্ট হারে discount এ discount ধার্য করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এই discount ধার্য করার রীতি-এমন কি bill of exchange-কাটার নিয়মকে গ্রহণ করিতে পারিবে না, উহাকে বরং এই পদ্ধতিকে খতম করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কার্যকর পন্থা কি হইবে, তাহা এখানে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বিল অব এক্সচেঞ্জ-এ অর্থ বিনিয়োগ:

চাওয়া মাত্র অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা (on demand bills) বর্তমান সময়ে ব্যাংকের;পূর্বনির্ধারিত ক্ষয়কারদীদের (customers) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ব্যাংক ইহাতে সাধারণত: কোন সুদের দাবি করে না, দাবি করে নির্দিষ্ট কমিশনের।আমেরিকায় বাহিরের কোন চেক পেশ করা মাত্র সাধারণ নিয়মে কোন রূপ সুদের দাবি না করিয়াই নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় দেশে এই খাতেও সুদগ্রহণ করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বিনা সুদে এই কাজ ৩০-৬০-৯০ দিনের মেয়াদের জন্য করিতে পারে। কিন্তু তাহা ব্যবসায়ের মূল অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া করিতে হইবে। ঋণের জামানত হিসেবে ও ব্যাংক এইসব চেক গ্রহণ করতে পারে কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এইসব বিল ফেরত পাওয়ার আইন খুব কঠোর হইতে হইবে।

কৃষি লোনে অর্থ বিনিয়োগ

কৃষিজীবীরা কৃষি খাতে মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাভাবে শোষিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা সাধারণত সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা তাহাদের কৃষিকার্যের উন্নয়ন বা অধিক ফসল ফলানোর কাজে খুব কমই ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা যখন ফসল কাটিয়া ঘরে লইয়া যায়, তখন উহার বেশীর ভাগই ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিয়া ও উহা হইতে ঋণ শোধ করিয়া তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তামূলক কাজে উহার খুব সামান্য অংশই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ইসলামী কৃষি ব্যাংক এই খাতেও অংশীদার হিসাবে অর্থবিনিয়োগের কাজ করিতে পারিবে। কৃষিজীবীদের কল্যাণ সমবায় ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ হইতে পারে। ব্যাংক কৃষকদের কৃষিযন্ত্র (implement) ও বীজ দিতে পারে এবং ফসলের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া প্রকৌশল পর্যায়ের (technical) পরামর্শ, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদি পরিবেশন করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি বিধান করিতে পারে। এই নব ব্যাংক স্থানীয় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে ও নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের সহিত পারস্পরিক স্বার্থসম্পন্ন কাজ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

বস্তুত কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া পারস্পরিক কৃষিব্যবসায়ের ব্যাংক গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যাংক কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ করিবে এবং ফসল হইতে পূর্ব নির্দিষ্ট হারে মুনাফা ও প্রদত্ত মূলধন ফিরাইয়া লইবে।

সুদবিহীন ব্যাংক জমা গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ছাড়াও আধুনিক ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করিতে পারে। ন্যায্য খরচ আদায় করিবার জন্য মূল্যবান জিনিসসমূহ বন্ধক বা হেফাযতে রাখিতে পারিবে। তাহাতে কোনরূপ সুদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। অনুরূপভাবে একস্থান হইতে স্থানান্তরে মূলধন পাঠান এবং bill collection-এর কাজ করাও সম্ভব হইবে।

মূলধনের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা:-

সুদবিহীন ব্যাংক জনগণের জমাকৃত মূলধনের সংরক্ষণ ও উহার নিরাপত্তা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ব্যাংক যেসব ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করিবে, তাহাতে অংশীদার ও মূলধন প্রদানকারী (Financier) হিসাবে কাজ করিবে। উহাতে যদি লোকসান (Loss) হয়, তবে তাহা জমাকারীদের উপর ধার্য হইবে না, কেননা তাহারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশীদার (active partners) নয়। তাহারা বড়জোর নিষ্ক্রিয় অংশীদার ও মূলধন প্রদান (Sleeping partners and financiers) মাত্র।কাজেই ব্যবাসায়ে ক্ষতি (loss) হইলে তাহা হয় রিজার্ভ ফান্ড হইতে পূরণ করা হইবে, না হয় ব্যাংকের অংশীদাররা তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে। কেননা, ব্যাংকে জমা রাখা টাকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহারাই দায়ী আর ব্যবসায়ে মুনাফা হইলেও তাহা তাহারাই পাইবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ দান

সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক কেবল যে ব্যবসায়ী মূলধন সংগ্রহের কাজই করিবে তাহা নয়, এই ব্যাংক ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য ও বিনাসুদে ঋণ দান করিবে।

বস্তুত সমাজের বহুলোকই ব্যক্তিগত প্রযোজন পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের হয়ত বিষয়- সম্পত্তি রহিয়াছে কিংবা ভবিষ্যতেও অর্থ আমাদানীর আশা আছে। কিন্তু উপস্থিত প্রয়োজন পূরণের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার দরুণ সাময়িকভাবে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নাই, তাই ইসলামী সমাজে এসব ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে বিনাসুদে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা একান্তই অপরিহার্য।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের যে প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা দুই পর্যয়ের হইতে পারেঃ নিতান্ত মৌলিক প্রয়োজন এবং অন্যান্য সাধারণ ধরণের প্রয়োজন। এই উভয় পর্যায়ের প্রয়োজন যথার্থভাবে পূরণ হওয়ার সষ্ঠু ব্যবস্থা না হইলে জনগণের জীবনযাত্রা সুখ ও সমৃদ্ধি পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে এইসব ক্ষেত্রেই জনগণের সহিত পুরাপুরি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্টের অন্যতম দায়িত্ব বিশেষ।

ব্যাংক মূলতঃ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। মুনাফা অর্জনই উহার আসল উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য। উহার উপর প্রধানত মুনাফাজনক কাজ-কারবারে বিনাসুদে ঋণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত। তাই ব্যাংক হইতে ঋণ পাওয়ার প্রধান অধিকারী হইল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও বিনাসুদে ঋণ দানের কাজ করার দায়িত্ব উহার উপর চাপানো যাইতে পারে। এজন্য দুইটি পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

প্রথম এই যে, যে ব্যাংকে যাহার ঋণ গ্রহণের হিসাব খোলা রহিয়াছে, বিশেষ অবস্থায় উহা হইতে জমা টাকার অধিক (overdraft) গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হইবে। এইজন্য প্রয়োজন মত নির্ভরযোগ্য জামানত (security) ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্যাংকে বহু লোকের এমন বিপুল পরিমাণ অর্থও পড়িয়া থাকে, যাহা সাধারণত নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে তোলা হয় না এবং বিশেষ কোন ব্যবসায়েও তাহা লগ্নি করা হয় না। ব্যাংক এইসব টাকা লোকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরনার্থে বিনাসুদে ঋণ বাবদ দিতে পারে। ইহাতে ব্যাংকেরও যেমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তেমনি টাকার মালিককেও এজন্য কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না।

আর দ্বিতীয় এই হইতে পারে যে, ব্যাংক দ্রব্য ক্রয় সার্টিফিকেট জারী করিবে। কোন স্থায়ী ব্যবহার্য দ্রব্য বাকী, মূল্যে খরীদ করা হইলে সেই সার্টিফিকেট

বিক্রেতাকে দিবে এবং বিক্রতা উহা ব্যাংকে জমা করিয়া মূল্য আদায় করিয়া লইবে। ইহাতে দ্রব্যের ক্রেতার উপর অর্পিত হইবে।

এই উভয় প্রকার ব্যক্তিগত ঋণ শেষ পর্যন্ত যদি ঋণ গ্রহণ কারীর প্রকৃত অর্থিক অক্ষমতার দরুণ পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে উহা পরিশোধ করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তিবে। ইহা যেমন নূতন কিছু নয়, তেমনি অবাঞ্ছনীয়ও কিছু নয়। রাষ্ট্রের যাকাত-ফিতারার ফান্ড হইতে এই ধরনের ঋণ শোধ করা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নিয়ম। নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রাধান হিসাবেই ঘোষাণা করিয়াছিলেনঃ

আমি মুসলমান জনগণের তাহাদের নিজেদের তুলনায় অনেক নিকটবর্তী। অতএব কোন মুসলমান যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়া মরিয়া যায়, তবে উহা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে। আর যে লোখ সম্পদ রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ইসলামী রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থতাবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং মুদ্রা ও যাবসায় সংক্রান্ত সরকারী নীতির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কায়েম করা অপরিহার্য। এই ব্যাংক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলিবে। মুনাফা লাভ করা ইহার উদ্দেশ্য হইবে না, বরং সার্বিভাবে জন স্বার্থ সংরক্ষণ ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর উন্নয়ন সাধনই হইবে ইহার আসল দায়িত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির মতই কাজ করিবে। উহা কারেশী নোট জারী করিতে পারিবে।

সরকারের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেন-দেনও ইহার মাধ্যেমেই সম্পন্ন হইবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কজনিত আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রণও এই ব্যাংক করিবে। একটি সাধারণ ব্যাংক কারবারী বাক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের ক্ষেত্রে যেসব নায়িত্ব পালন করিয়া থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের জন্য সেইসব দায়িত্ব পালন করিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন দেশে একান্তভাবে সরকার পরিচালিত হইয়া থাকে। আবার অনেক রাষ্ট্রে জনগণ ও সরকারের সম্মিলিত ব্যবস্থাধীনও উহা চলিতেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ার মূলধন (share capital) হয় একা শবনমেন্ট দিবে; কিংবা জনগণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় উহা গড়িয়া উঠিবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমূহ পালন করিতে হয় বিধায় উহার সরকারী ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়াই বিধেয়। তাই উহার পরিচালনার তার জনগণ ও সংকার নির্বাচিত ডাইরেক্টর্স বোর্ডের উপর অর্পন করা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সহিত অধিক সামস্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:-

ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীয় দায়িত্ব নিয়োস্কৃত কার্যাবলীর মাধ্যমে পালন

(১) মুদ্রা প্রচলন ও উহার নিয়ন্ত্রণঃ ব্যাংক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই দায়িত্ব পালন করিবে, ইহা করিবে সম্পূর্ণ সুদ বিবজির্ণ পদ্ধতিতে। বর্তমান বাংক-কারবারের এই কাজে কোন সুদের অবকাশ নাই।

(২) supply of credit : বর্তম্যান এই কাজ সম্পূর্ণরূপে সুদের ভিত্তিতে সম্পন্ন হইতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীয় সদস্য ব্যাংকও অন্যান্য মূলধন সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান (Credit agencies) সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ঋণ বিতরণ করিবে। ইসলামী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমগ্র দেশ হইতে সুদী কারয়ারকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবে এবং স্বীয় সাবাসা-ব্যাংক ওদিকে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে উহাতে পুঁজি বিনিয়োগ করিবে। এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্য ব্যাংকসমূহের লাভ-লোকসানের অংশীদার হইবে। সারা দেশের ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ইহা এক উত্তম পন্থা। সদস্য ব্যাংক সঠিকভাবে তাজ না করিলে উহা কেন্দ্রেীয় ব্যাংক প্রদর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং স্বীয় কাজ-কারবারকে সম্পাসারিত করিতে সমর্থ হইবে না।।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্য ব্যাংকসমূহকে উহাদের কারবারের লাভ-লোকসানে শরীক না হইয়াও ঋণ নিতে পারে। দেশের মূলধন (credit) সহজ লভ্যতাকে অধিক ব্যাপক করা এবং উহার মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার অকাজে পড়িয়া থাকা মূলধন সদস্য ব্যাংকগুলিকে বিনাসুদে ঋণ বাবদ নিতে পারে। ফলে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনানুযায়ী সাধ্যমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে বিনাসুদে ঋণ লাভ করিতে পারিবে।

(৩) ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ (control of banking system) কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি পন্থাই প্রয়োগ করিতে পারে, ডাহা হইল, ব্যাংকের বিজ্ঞার্ড পরিমাণ, খোলা বাজারের রীতিনীতি ও ব্যাংকের হার-এর সীমা নির্ধরিব প্রভৃতি। ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদবিহীন নীতি ও সার্বিক কল্যাণকর যাবতীয় পন্থায়ই কাজ করিতে পারিবে।

(৪) রাষ্ট্রীয় অর্থ ও জনগণের ফান্ডঃ মূলত রাষ্ট্র সরকারই ইহার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন হইবে। ইহার দুইটি খাত থাকিবেঃ আয় ও ব্যয়। অনেক সময় ব্যয় আয়ের তুলনায় অনেক বেশী হইয়া থাকে। তখন হয় নূতন কর ধার্যের সাহায্যে অভাব পূরণ করা হয়; কিংবা সরকারী দায়িত্বে বক্স আকারে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। ইহাকে গণ-ঋণ (Public Detit) বলা হয়। প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্রই এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে যে সুদ দেওয়া হয় তাহার বোঝা প্রকারান্তরে সমগ্র দেশের করপ্রদাতা জনগণের উপরই চাপানো হয় এবং ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের সুদ।

বস্তুত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই গণ-ঋণ গ্রহণে বাধ্য। না নিলে উহা কোন কাজই করিতে পারে না, এমন কোন কথা নাই। কেননা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ভিন্নতর উপায়েও পূরণ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত সরূপ বলা যায়, আমেরিকার ফেডারেল সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহও গণ-ঋণ গ্রহণ করে এবং আর্থিক উন্নয়নে গণ-ঋণ অপরিহার্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই দেশেরই ইন্ডিয়ান রাজ্য সরকার কোন গণ-ঋণ গ্রহণ করিতেছে না। এই রাজ্যসরকার গৌরব সহকারে বারবার ঘোষণা করিয়াছে।

ইতিয়ানা-সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত, প্রথম দশ বৎসরকালীন শিল্পোন্নয়নে অগ্রবর্তী, অধিকাংশ শিল্প-সংস্থা ঋণ-বিমুক্ত ইন্ডিয়ানা রাখোই করাবার করিতে চাহে কেন?

আমেরিকার Capital journal পত্রিকা ১৯৫৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায় ইহার কারণ পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছে।

'এই রাজ্যে গণ-ক্ষণ বলিতে কিছুই নাই। ইন্ডিয়ানা আজও সেই ঘোলটি রাজ্যের অন্যতম, যাহা স্বীয় আয়ের দ্বারাই, চলিতেছে। ১৯৪৬ সনে এইরূপ রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৪১ টি। ইরিয়ানা রাজ্যে সরকার কোন গণ ঋণে ঋণী নয়। অথচ পূর্বে ইহার ঘাট বিলিয়ন ডলারের বাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় ঋণে কণী ছিল। অতঃপর ইহাতে গণ-

ঋণ গ্রহণ করা শাসনতান্ত্রিকভাবেই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই কারণে, এখানকার শিল্পসংস্থা অতীতের ক্ষণের ভিত্তিতে কোন সওদা করে না।'

(Reported by Indiana Department of commerce, Indiana P. 45 Indiana, USA.)

ইহা হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, গণ-ঋণ ব্যতীত এবং কেবলমাত্র নিজস্ব আমদানীর উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যকটি রত্রেই সুষ্ঠুজপে চলিতে পারে ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করিতে পারে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র সাধারণত সুদভিত্তিক ঋণ তো দূরের কথা, কোন প্রকার ঋণ ব্যতীতই স্বীয় কাজ সমাধা করিবে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

এতদসত্ত্বেও আমরা এখানে এমন একটি পন্থা নির্দেশ করিতে পারি, যাহা অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য বিনাসুদে অর্থ সপ্তাহ করা যাইতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পাবলিক ফান্ড শুরু করিবে না। এই ফান্ডটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করিয়া জনগণকে উহাতে অর্থদানের সাধারণ আহবাদ জানান হইবে। ইহাতে যে মূলধন সংগৃহীত হইবে, সরকার তাহা বিভিন্ন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ করিবে। উহা হইতে লব্ধ মুনাফা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হার মত বণ্টন করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সরকার রেল বিভাগ সঙ্গাসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। উহার জন্য জনগণের মধ্যে অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। এজন্য সরকারী পর্যায়ে সিকিউরিটি সার্টিফিকেট (Investment securities) ইস্যু করা হইবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পর ইহাতে যে মুনাফা হইবে তাহা মূলধন প্রদাতাদের মধ্যে তাহাদের মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটা Trust Fund-সরকারী নেতৃত্ব চালাইতে পারে।

তাহাতে ব্যাংক উহার উদ্ধৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ করিতে পারে। যেসব সরকারী পরিকল্পনায় মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, মুনাফামূলক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কাজ শুরু করাও উহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব হইল ইসলামের ব্যাংক-ব্যবস্থা পুনগঠন করা। যাহার ফলে আধুনিক ইসামী সমাজের সমস্ত আর্থিক প্রয়োজন ইসলামসম্মত পন্থায় পূরণ হইতে পারিবে ও আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুকাবিলাও করিবে।। উহার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল, আতীয় সম্পদকে জনগণের মধ্যে ইনসাফ মুতাবিক বণ্টন ও আবর্তিত হওয়ার নির্ভরযৌগ্য ব্যবস্থা করা, উহাকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ধনীদের মুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে না দেওয়া, কেবল বড় বড় পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানাকেই ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবসায়েও যাহাতে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ ও মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

ইহার ফলে দেশের সর্বসাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সুখ ও সমৃদ্ধপূর্ণ হইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সমস্ত ব্যাংক ব্যবসায়ের উপর পূর্ন কার্যকর করিতে হইবে, যেন সমাজে সুস্থ ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা ও সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবসায় ব্যাপকভাবে চালু হইতে পারে।

বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামী ব্যাংক:-

বস্তুত ইসলামী ব্যাংককে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় ও ধন-বিনিময়ের অপরাপর আন্তজাতিক বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, সহযোগিতা ও আদান পদান করিতে হইবে। দুনিয়ার অমুসলিত সমাজ ও রাষ্ট্রেন সহিত ব্যবসায় সংক্রান্ত যোগাযোগ মজবুত করার দায়িত্বও উহাকেই পালন করিতে হইবে। কিন্তু

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুদ বিমুক্ত লেন-দেনের ব্যবস্থা কার্যকর করা সহজ হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাড়াইবে। কেননা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদই হইল যাবতীয় লেন-দেন ও আমদানী রপ্তানীর ভিত্তি। রপ্তানীকারক দেশ রপ্তানী পণ্যের উপর এবং আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানীকারক দেশ আমদানী পণ্যের উপর নিশ্চিতরূপেই সুদ ধার্য করিয়া থাকে। ব্যাংকের মাধ্যমে এল, সি (Letter of credit) খোলার জন্য বর্তমানে সুদ দেওয়া-নেওয়া অনিবার্য হইয়া আছে অথচ ইসলামী ব্যাংককে ইহ্য সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া কাজ সমাধা করিতে হইবে।

এইরূপ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সর্বপর্যায়ের ব্যবসায় কেন্দ্রীয় ইসলামী কমার্সিয়াল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে হইবে এবং বৈদেশিক সুদের আদান-প্রদানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এমনভাবে পালন করিতে হইবে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মকভাবে সুদী লেস-দেন খতম করা সম্ভবপর হয়। এজন্য আমরা প্রথম পর্যায়ে একটি বৈদেশিক সুদমুক্তির ফান্ড' (pool for foreign interest) গঠনের প্রস্তাব করিব। বৈদেশিক ব্যবসায়ের সব কাজ এই ফান্ডের মাধ্যমে সমাধা করিতে হইবে। এই ফান্ডের সাহায্যে ইসলামী ব্যাংকের আমদানীকারক অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের আনুপাতিক বিকল্প বৈদেশিক ব্যবসায়ের সুদ বৈদেশিক ব্যাংকে আদায় করিবে। আবার রপ্তানী পর্যায়ে বৈদেশিক ব্যবসায়ের উপর অন্যানা দেশ হইতে অর্জিত সুদের বদলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের আনুপাতিক মুনাফা ইসলামী ব্যাংককে প্রদান করা হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে যদি পণ্য আমদানী করে এবং সে জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক ব্যাংকে এল, সি, খোলে, তবে আমদানীকারককে সে ব্যাংককে অবশ্যই পণ্য মূল্য পরিমাণ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ দিতে হইবে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্র হইতে কোন দ্রব্য কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানী করিতে হইলে এদেশের ইসলামী ব্যাংকেই এল, সি. খুলিতে হইবে ও আনুপাতিক হারে উহাকে সুদ আদায় করিতে হইবে।

এই বৈদিশিক সুদের লেন-দেন বন্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক উপরোক্ত ফান্ডের মাধ্যমে উহাকে নিয়ম সম্মত বানাইয়া লইবে। উহার বাস্তব পন্থা এই হইবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমদানীকারক অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় লব্ধ মুনাফার আনুপাতিক অংশ (equitable share) সিদ্ধ দেশের ব্যাংককে আদায় করিয়া দিবে, যাহা কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংকের এই ফায়ে জমা করা হইবে এবং এই ফান্ড হইতে বিদেশী ব্যাংকের বিকস্তু সুদ আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রপ্তানীকারী ব্যাংক আমদানীকারী বিদেশী ব্যাংক হইতে বৈদেশিক ব্যবসায়ের পরিমাণের উপর মেয়াদ অনুযায়ী সুদ লাভ করিবে। এই সুদ ও উক্ত ফান্ডে জমা করিয়া দেওয়া হইবে। আর কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংক এই ফান্ড এইরে বিকল্প অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে আনুপাতিক মুনফা ইসলামী ব্যাংককে দান করিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ফান্ড ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে চলিবে। ব্যাংক বাবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাতে কমবেশী করারও অবকাশ রহিয়াছে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে সুন বর্জনের জন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন কিছুমাত্র অভিনব বা ইললামী আদর্শের প্রকৃতি-বিরোধী নহে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় শুল্ক ধার্য করিয়াছিল। ইহার জওয়াবে হযরত উমর (রা) ও ইসলামী রাষ্ট্রে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর সরকারী শুল্ক ধার্য করিয়াছিলেন। আমাদের সুন মুক্তির আলোচ্য পরিকল্পনা ইহারই আধুনিক ও বিবর্তিত রূপ মাত্র।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র অতি সহজেই সুদের আন্তজাতিক আদান-প্রদানের প্রথা চিরতরে খতম Eiminated করিতে সক্ষম হইবে। কেননা উক্ত পরিকল্পনার শেষ পরিণতি এই দাড়াইবে যে, সুদের সর্বপর্যায়ের আদান প্রদানই শেষ হইয়া যাইবে। উহাতে এইরূপ সংশোধন করিয়া লওয়া যাইবে যে সুদের আর্থিক মূল্য ও আনুপাতিক মুনাফার আর্থিক মূল্য নির্ধারণের পরিবর্তে অর্থ আদায়ের জন্য কোন উপযুক্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হইবে এবং ৩০,৬০, কিংবা ৯০ দিনের sight bilts of usance bills-এর প্রবর্তন

করা হইবে, বৈদেশিক ও অতান্তরীণ বাণিজ্য bills of exchange-এর নিয়মে সমস্ত আদান-প্রদান নিয়মিত করিয়া লইতে এইবে। এইভাবে আর্থিক জগতে ইহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুদকে খতম করিতে হইবে। ইহার ফলে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা কেবল বাস্তব (practicadle) প্রমাণিতই হাইবে না, ইহার দরুণ উত্তার উন্নতি বিধান করিয়া সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিক্রি করা সম্ভবপর হইবে। শেষ পরিণতি স্বরূপ সমস্ত আর্থিক লেন-দেনে সুদের হার গুলোর (Zero rate of interest) কোঠায় আসিবে এবং বিশ্বমানবতা সর্বপ্রকার শোষণ ও নিয়তিন এবং হারাম কাজের অভিশাপ হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবে।

উন্নয়ন :-

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এইজন্য বিপুলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার উন্নয়নের চরম লক্ষ্য।

অর্থনীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য এই পরিকল্পনা একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ও মৌলিক প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিতে হইবে।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবতামুখী ও প্রয়োগমুখী হইতে হইবে। ইহার মাধ্যমেই ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধকে বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়িত হইতে হইবে। বাস্তবতাহীন ইসলামী মূল্যবোধ শূন্য কোন উন্নয়ন ইসলামী অর্থনীতিতে আদৌ স্বীকৃত নয়। উন্নয়নের কাজ হইলো সামাজিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠন। এই পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ হইলো :

(ক)সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও পূর্বপরিকল্পিত হইতে হইবে। একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ শুরু করিতে হইবে। সেজন্য যাবতীয়

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হইতে হইবে। মনে এই দৃঢ়মূল করিয়া লইতে হইবে যে, মানুষ এই বিশ্বলোকে মহান স্রষ্টার এক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা। অতএব মানুষই হইল এখানকার সামাজিক পরিবর্তনের আসল হোতা, উদ্যোক্তা ও সক্রিয় কর্মকর্তা।

(খ) সামাজিক পরিবর্তন ইসলামে কোন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহীত নয়। ইহার ব্যাপক তাৎপর্যই ইসলামে কাম্য। গোটা পরিবেশের পরিবর্তন, ব্যক্তিগণের চিন্তা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও কর্মনীতি দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন, জীবন লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ ও উহার বাস্তবায়ন এই সব কিছুই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ক্ষেত্র।

(গ) পরিবর্তন অর্থ বর্জন ও গ্রহণ-গ্রহণ ও বর্জন, সম্পর্কের কাটছাট, সমতার একটা পর্যায় হইতে উচ্চতর একটা পর্যায়ের অথবা অসমতার একটা অবস্থা হইতে সমতার একটা অবস্থার দিকে সুসমগতি অবলম্বন। পরিবর্তনটা হইবে অতীব ভারসাম্যপূর্ণ, বিকাশমান ও ক্রমিক পদ্ধতির অনুসারী।

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলিতে গোটা মানবতার উন্নয়নই বুঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন উহার একটি অংশ মাত্র। উহা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ইসলামে মানবীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব। ইসলামে উন্নয়নের দার্শনিক ভিত্তি ইহল (১) তওহীদ-আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতা, (২) জীব ও প্রাণীকূলের সঠিক জীবিকার দায়িত্ব ও ব্যবস্থা গ্রহণ, (৩) মানবীয় খিলাফত এবং (৪) তাযকীয়া। ইসলামের উন্নয়ন পরিকল্পনা এই চারওটি মৌল আকীদাহর উপর ভিত্তিশীল।

বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক পরিচালক একমাত্র আল্লাহ্। তাঁহারই বিধান যেমন প্রাকৃতিক জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর কার্যকর, তেমনি কার্যকর

হইতে হইবে সমগ্র মানুষের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজের উপর। সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান- বংশধর। অতএব মানুষে মানুষে কোন দিক দিয়াই কোনরূপ তারতম্য বা পার্থক্য হইতে পরিবেনা। এই পৃথিবীতে মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহর খলীফা-প্রতিনিধি। অতএব জীবন পরিচালনার জন্য মানুষ নিজেরা কোন মৌলিক বিধান রচনা করিবে না, আল্লাহর দেওয়া বিদান পালন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করিবে জীবনের সমগ্র দিকে ও বিভাগে। আর এই বিধান পালন অনুসরণ বাস্তবায়নের চরম লক্ষ্য হইল মানুষের সঠিক তাষকীয়া- পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার ও পবিত্র করণ-হৃদয়-মন-চরিত্র ও যাবতীয় কাজ-কর্মের। তাযকীয়াও শুধু তাযকীয়ার জন্য নয়। বরং ইহকাল ও পরকালীন ফালাহ-পূর্ণমাত্রার কল্যাণ লাভই হইল ইহার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

এই চারটি মূল আকীদাহ শাশ্বত ও চিরন্তন। কাল ও অবস্থা পরিবর্তনের কোন এক বিন্দু প্রভাবও ইহার কোন একটির উপরও প্রতিফলিত ইহতে পারে না। এই মূল্যমান ভিত্তিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা অবশ্যই বিশাল ক্ষেত্রে ও ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হইবে। তাহাতে শামিল থাকিবে নৈতিক আত্মিক-আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক-বস্তুগত সমস্ত দিক ও বিভাগ। এখানে উন্নয়ণ একটা মূল্যমান সমন্বিত কর্মতৎপরতা। মানুষের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধনের আশাবাদ অনুপ্রাণিত। এখানে মানুষই হইল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দু (Central point)। তাই ইসলামের উন্নয়ন অর্থ মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, তাহার প্রাকৃতিক ও মানসিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন এবং সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। বস্তুতঃ ইসলামের উন্নয়ন-ক্ষেত্র বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত।

উন্নয়ন মুসলমানদের জন্য কেবল জাতীয় পর্যায়েই প্রয়োজনীয় নয়, বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতেও উন্নয়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক দিয়া মুসলিম জাহানের একটা বড় দায়িত্ব অর্থনৈতিক পুণর্গঠন। এই পুণগঠনের কার্যক্র মুসলিম জাহানের আদর্শিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিশ্ব-দায়িত্বের সহিত সমানুপাতিক (Commensurate) হইতে হইবে। পশ্চিমা শিল্পোন্নত

পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত গোঁজামিলের প্রতিযোগিতা করাই উহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এজন্য মুসলিম জাহানকে সামগ্রিকভাবে নিজস্ব মানদন্ড বা model কে সম্মুখে লইয়া কাজ করিতে হইবে। এই পর্যায়ে তিনটি অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে এড়াইয়া যাইতে হইবেঃ

(ক) মুসলিম জাহানের ব্যাপক অর্থনৈতিক অনুন্নত অবস্থা অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতা। অব্যবহৃত ও অপর্যাপ্ত ব্যবহৃত মানবিক ও প্রাকৃতিক উপায় উপকরণের ব্যবহার ও প্রয়োগ। মূলত, ইহা না হওয়ার কারণেই মুসলিম জাহানে দারিদ্র্য স্থবিরতা ও গতিহীনতার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(খ) মুসলিম দেশসমূহে সৃষ্ট ব্যাপক কাঠামোগত, সামাজিক নৈতিক বিফলতা ও সম্বাৎসরিক অনশন।

(গ) প্রবৃদ্ধি আত্মস্থ করিতে না পারা। ফলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা তীব্র ও প্রকট হওয়া। আমদানী করা প্রযুক্তি প্রয়োগে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অন্ধভাবে নকলনবিশী করা।

পরিকল্পনা :-

রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম নিজের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির গভীরভাবে যাচাই করিতে হইবে। সমগ্র দেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং দেশের বিপুল জনগণকে একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি ও সভ্য মানুষের সমাজ হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ করিয়া একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী নাগরিকদের ন্যায় সকল মর্যাদা সহকারে জীবন ধারণের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য কি কি জিনিসের অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনীয়

জিনিসের পরিমাপ হইয়া যাওয়ার পর যাঁচাই ও তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে যে, দেশের এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টি কোথায়, কি পরিমাণের ও কি অবস্থায় বর্তমান আছে; এবং কি কি জিনিস মওজুদ নাই। আর মওজুদ জিনিসগুলিকে অধিকতর কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সেজন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে পারে, তাহাও গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অতঃপর যেসব অপরিহার্য জিনিস বর্তমান নাই, তাহা লাভ করিবার উপায় ও সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকে। পরিকল্পনা গ্রহণকালে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাপ করা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত সম্পদ অপরিমেয় ও সীমাসংখ্যাহীন হইতে পারে না- সীমাসংখ্যাহীন হইয়া থাকে দেশের অনিবার্য প্রয়োজন ও সমস্যা; এই জন্যই এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা মারফতে স্বীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদকে অপরিসীম জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার কাজে প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করাই হইতেছে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গোড়ার কথা।

হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন:

كان الفقر أن يكون كفراً

'দারিদ্র্য কুফরে পরিণত হইতে পারে' বা 'দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানাইয়া দেয়।' অথচ কুফরকে নির্মূল করিবার জন্যই হইবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কাজেই দারিদ্র্য দূরীভূত ও দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করিবার জন্য উহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্যও উহাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের জনশক্তিকে (Human power) ও পুরাপুরি কাজে লাগানো ও কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য কাজের ও উপার্জন উপায়ের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিধায় সর্বাধিক পরিমাণে জনশক্তি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা একান্তই আবশ্যক। বিশেষ করিয়া আধুনিক অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বেকার সমস্যা একটি অতি বড় হুমকি ও বিরাট চ্যালেঞ্জ হইয়া দেখা দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু ইহা এক বিরাট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবীয় সমস্যাও বটে। কাজেই বেকার সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই কল্যাণ রাষ্ট্র হওয়ার দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তাই ইহার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের ফলে উদ্বৃত্তি ও পুঁজিবিনিয়োগ সমানভাবে চলিতে থাকিবে এবং বেকার সমস্যা দেশ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। লর্ড কিনসের (Lord keynes) মতে উদ্বৃত্তি ও পুঁজিবিনিয়োগের। অসামঞ্জস্যই হইতেছে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের প্রকৃত কারণ। এই অবস্থাকে যতদিন দূরীভূত করা সম্ভব না হইবে ততদিন পর্যন্ত কোন সমাজে স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র। দেশের সকল নাগরিকের জন্যই কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়া যে রাষ্ট্রের কর্তব্য, দুনিয়ার সকল অর্থনীতিবিদই এসম্পর্কে একমত। বেকারত্ব একটি মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি, ইহা সমাজের কোথায়ও স্থান পাইলেই গোটা সমাজ-দেহকে পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া দেয়, সে জাতিকে সর্বেতিভাবে ধ্বংসের চরম সীমায় নিয়া পৌঁছায়। শুধু তাহাই নয়, বেকার-সমস্যায় সামগ্রিকভাবে জাতির কর্মক্ষমতা, নৈতিক চরিত্র ও আত্মসম্মান-জ্ঞান প্রভৃতি সকল মহৎ গুণই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই জন্য দেশীয় সকল প্রকার কৃষিকার্য ও শিল্পোৎপাদনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা,

উচ্ছৃঙ্খলা ও অসংবদ্ধতা বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার পথ বন্ধ করা জাতীয় জীবনের সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য অপরিহার্য। সম্পত্তি ও সম্পদ জাতীয়করণ (সমূহবাদ) এবং স্বাধীন ও নিরংকুশ পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনের (পুঁজিবাদের) মধ্যবর্তী এক সুবিচারপূর্ণ ও প্রয়োজন পূর্ণকারী নীতি হইল পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা অনুসারে ধনোৎপাদনের সকল 'ফ্যাক্টর' সক্রিয় করিয়া তোলা। পুঁজিদার ও কারখানা মালিককে নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছামত পুঁজি বিনিয়োগ ও পণ্যেৎপাদনের অবাধ সুযোগ দেওয়া এবং একান্তভাবে তাহাদেরই উপর নির্ভর করা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। বরং একটি সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ধন উৎপাদনের সমগ্র 'ফ্যাক্টারকে' জাতীয় কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন অবাধ ও নিরংকুশ ধনোৎপাদনের পথ (Liassez Faire) বন্ধ করিতে হইবে।

সর্বোপরি পরিকল্পনায় কেবল যান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না, বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে ধন-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইতে নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর প্রয়োজন পূরণ, সর্ববিধ কল্যাণ সাধন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হইবে কিনা। বস্তুত পরিকল্পনা উদ্দেশ্য লাভের একটি উপায় মাত্র নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়। এই জন্য সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও ইসলামী পরিকল্পনায় মৌলিক পার্থক্য থাকিতে বাধ্য।

হয়।

দেশের কুটিরশিল্প ও ছোট আকারের শিল্পের উপরও এই পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেক দেশেই কুটির শিল্পে ও ছোট আকারের শিল্পই হয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সর্বপ্রধান উপায়। এই ধরনের শিল্প উন্নয়নের জন্য খুব বেশী মূলধনেরও আবশ্যক হয় না। অথচ ইহার সাহায্যে প্রত্যেক সমাজের বিপুল-সংখ্যক মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা সম্ভব এবং

দেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার যোগ্য হইতে পারে। দেশের জাতীয় অর্থনীতির যে প্রধান চাপ থাকে কৃষিকার্যের উপর, কুটির শিল্প উন্নয়নের সাহায্যে তাহা অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হইলে যেসব লোকের বেকার হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে, কুটির ও ছোট আকারের যন্ত্রশিল্প উন্নয়নের দ্বারা তাহাদিগকে কর্মে পূনর্নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে।

কুটির শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়ন যন্ত্রশিল্পেরও প্রসার করিতে হইবে, ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় বর্তমান যান্ত্রিক দুনিয়ার প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখ টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের প্রসার সৃষ্টির সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহার প্রবল ও অপ্রতিহত চাপে পড়িয়া কুটির শিল্প যেন ধ্বংস হইয়া না যায়। এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র এই উভয়বিধ শিল্পের সংরক্ষণ এবং উভয়েরই ক্ষেত্র ও সীমা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ সর্ব প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ; ভারী শিল্পের উৎপাদন ইহার পরে স্থান লাভ করে। প্রথমটিকে উপেক্ষা করিলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা তীব্র হইয়া উঠিবে এবং ভারী শিল্প উৎপাদনের উদ্দাম গতিতে জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িবে। অধিকতর রুটি, মাখন, কাপড় ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে তখন বন্দুক, বেয়নেট ও বোমার উৎপাদনই বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনা গ্রহণকারী কমিটিকে নিম্নলিখিত নীতিসমূহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবেঃ

(১) পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সে যে রাষ্ট্রই হউক না কেন- অন্ধ অনুকরণ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধানত ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কাজেই অন্ধভাবে পরের অনুকরণ না করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সঙ্গতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করা নিজ দেশীয় উপাদান ও কাচামালের সাহায্যেই সম্ভব হইবে-বৈদেশিক মূলধন ও ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। কারণ তখন বিদেশ হইতে কেবল টাকা আর মূলধনই আসে না, সেই সঙ্গে ঋণদাতা বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্ধন এবং বাধ্যবাধকতাও গোটা দেশকে গোলামীর নাগপাশে বন্দী করিয়া ফেলে। শুধু রাজনৈতিক গোলামীই নয়, বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নৈতিক দৃষ্টিভংগী ও মাপকাঠি এবং মতবাদ ও চিন্তধারার সর্বপ্লাবী সয়লাব আসিয়াও সারা দেশটিকে নিমজ্জিত করে। আর কোন ইসলামী রাষ্ট্রই যে তাহা বরদাশত করিতে পারে না, তাহা অনস্বীকার্য সত্য। কাজেই পরিকল্পনা রচনার সময় নিজ দেশীয় শ্রমশক্তি, মূলধন ও প্রাকৃতিক উপায়-উপাদানের পরিমাণের প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ ও অর্থ এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে স্বল্পতম অর্থব্যয় করিয়া বৃহত্তম ফল লাভ করা যাইবে, অর্থনীতির ভাষায়ঃ General allocation of resources and obvious result.

(৩) পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক জিনিস-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি-বিদেশ হইতেও আমদানী করা যাইতে পারে। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিকে অধিকতর মজবুত করিয়া তুলতে হইবে। অনুরূপভাবে সে বাণিজ্য এমন সব দেশের সহিত হওয়া উচিৎ, যেসব দেশ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হইবে। অন্যথায় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার সম্ভবনা রহিয়াছে।

(৪) সকল প্রকার পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে কার্যকর ও বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলা একান্তভাবে নির্ভর করে কর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক বিশ্বাস-পরায়ণতা ও দায়িত্ব জ্ঞাণের উপর। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে এইসব গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণরূপে

স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না। এই জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে সাধারভাবে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে এবং বিশেষ কিরয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে এইসব গুণ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্র-সরকার ও জনগণ যদি মূলধন বিনিয়োগ না করে তাতে কোন পরিকল্পনাই কার্যকর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক কার্যক্রম 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ নয়'। চক্ষু বন্ধ করিয়া সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করাও নয়। ইহা এক রূঢ় কঠিন ও বাস্তব কার্যক্রম। এখানে কোনরূপ অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও রংগীন স্বপ্ন সাধের অবকাশ নাই।

পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উদ্বৃত্তির উপর। জাতীয় উদ্বৃত্তির জন্য দরকার ব্যক্তিগত বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যাহাতে কিছু না কিছু অর্থ অবশ্যই সঞ্চিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা, যেন তাহার নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্বৃত্তিকে রাষ্ট্র- সরকারের নির্দেশ অনুসারে জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করিতে পারে।

শেষ কথা এই যে, নির্ভুল তথ্য ও সংখ্যা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া একটি চমৎকার পরিকল্পনা রচনা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়; বরং কঠিন কাজ হইতেছে তাহা কার্যে পরিণত করা। এই জন্য নাগরিকদের ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রয়োজন।

ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি :

রাষ্ট্রীয় আয় :-

রাজস্ব:-

রাজস্ব বলিতে কোন ব্যক্তি বা দলের সেই অর্থ বোঝায় যাহা সরকারি কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়।

ইসলামী অর্থনীতিতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে এই মূলনীতি মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে উহা ধার্য করার ব্যাপারে যেমন অন্যায় ও শোষণের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না, অনুরূপভাবে সংগৃহীত রাজস্ব যথেচ্ছ ভাবে ব্যয় করার অনুমতি বা অধিকার কাহারও নাই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় উহার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও একটি নিয়মে বাধা।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উপায় :-

১.সর্বপ্রকারের যাকাত, সাদকা, ওশর বা মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব,খনিজ সম্পদের"রয়ালটি "ইত্যাদি।

২.ভিন্ন জাতির নিকট হইতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, জিজিয়া, গনিমতের মাল, খারাজ বা অমুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা ইত্যাদি।

৩.দেশের সমষ্টিগত প্রয়োজন পুরনের জন্য নাগরিকদের নিকট হইতে চাঁদাবাবদ লব্ধ অর্থ।

বাবদ লব্ধ অর্থ।

নবী করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদুন কর্তৃক নির্ধারিত কর:-
নবী করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদুন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয় হিসাবে গণ্য করিয়াছেনঃ

(১) ভূগর্ভে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (২) রয়ালটি (৩) ইজারার খাজনা (৪) আমদানী ও রফতানী শুল্ক (৫) নদী-সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত সম্পদ (৬) মালিক বা উত্তরাধিকারীহীন ধন-সম্পত্তি (৭) মুদ্রাশিল্প এবং রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত জমি, বন ও শিল্প-ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা।

আয়ের উল্লেখিত উপায়সমূহকে পরিমাণের দিক দিয়া চার ভাগে বিভক্ত করা চলেঃ (ক) ভূমি রাজস্ব-ওশর, ওশরের অর্ধেক, খারাজ।

(খ) খুমুস-যেসব রাজস্ব মূল সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যথা- গণীমতের মাল, ব্যাক্তি-মালিকানার খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি।

(গ) যাকাত, সাদকা এবং নাগরিকদের নিকট হইতে লব্ধ টাকা। জিযিয়াও ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। (জিযিয়া, খারাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নাগরিকদের নিকট হইতে যাহা আয় করা হইবে, তাহার হার ও পরিমাণ নির্ধারণ ইসলামী রাষ্ট্রের বা পার্লামেন্টের কাজ।) যাকাত বিভিন্ন জিনিস হইতে বিভিন্ন হারে আদায় করার নির্দেশ রহিয়াছে।

(ঘ) মালিকবিহীন বা উত্তরাধিকারীহীন ধন-সম্পত্তি। ইহার সম্পূর্ণ ও সমগ্রটাই রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হইবে।

"উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় আয়সমূহকে অপর এক দিক দিয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ

(১) যেসব আয়ের ব্যায়-ক্ষেত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) এবং যেসব আয়ের ব্যয়-ক্ষেত্র নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালকদের (পার্লামেন্টের) উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। (অবশ্য তাহাও কুরআন হাদীসের মূল ভাবধারা অনুযায়ী জনগণের কল্যাণ দৃষ্টিতেই নির্ধারণ করিতে হইবে।)

ভূমি-রাজস্ব:-

রাষ্ট্রের সকল প্রকার ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্র-সরকারকে যে কর দেওয়া হয়, তাহাকেই ভূমি রাজস্ব বলে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-ওশরি জমি ও খারাজী জমি।
ওশরী জমি:- যে জমির মালিক মুসলমান, মুসলমানই যে জমি সর্বপ্রথম আবাদ ও চাষ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, মুসলমান যথারীতি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যেসব জমি দখল করিয়াছে এবং জমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে অথবা রাষ্ট্র যে জমি নাগরিককে চাষাবাদের জন্য দান করিয়াছে তাহা সবই ওশরী জমি।

খারাজি জমি :-যে জমির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমগণই যে জমি আবাদ ও চাষ উপযোগী করিয়া লইয়াছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র যেসব জমি অমুসলিমদের কাছে পাট্রা দিয়েছে এবং তাহাদের কবুলিয়াত লইয়া তাহাদিগকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তরিত করিয়া দিয়েছে তাহা সবই খারাজি জমি।

ইসলামী শরীয়তে ওশরের পরিমাণ :-

যেসব জমিতে পানি সেচ দেয়া লাগে না তার ওশরের পরিমাণ মোট উৎপন্ন ফসলের 10 ভাগের এক ভাগ।
এবং যেসব জমিতে পানি সেচ দেয়া লাগে তার ওশরের পরিমাণ মোট উৎপন্ন ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ।

খারাজ:-

খারাজ হল অমুসলিমদের মালিকানাভুক্ত জমি হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়।

খারাজ নির্ধারনের ব্যাপারে জমির গুনাগুন, উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজনীয় চাষের পরিমান পার্থক্য, পানি সেচের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন জমির প্রকৃত গুণ অনুপাতেই রাজস্ব ধার্য হইতে পারে।

বিভিন্ন সম্পদের এক পঞ্চমাংশ :-

গনিমতের মাল, খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রত্যেকটি হইতে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা করা হইবে।
কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুজাহিদগণ যে ধনসম্পদ লাভ করিয়া থাকে তাকে গনিমতের মাল বলে।

খনিজ সম্পদের রয়ালটি বাবদ উহার এক পঞ্চামাংশ বায়তুল মালে জমা হইবে।

একাধিকার ভুক্ত ব্যবসায়ের রাজস্ব :-

ইসলামী রাষ্ট্র কাউকে একচেটিয়া ভাবে ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার দিলে সেখান থেকেও মুনাফার দশ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালে জমা করিতে হইবে।

বন-সম্পদ আয় :-

ইসলামী রাজ্যের বন সম্পদ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আমদানির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপায়। ইহা সম্পূর্ণ রূপে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং উহার যাবতীয় আয় রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা হইবে।

সামুদ্রিক সম্পদের আয় :-

সকল প্রকার সামুদ্রিক সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উপায়। সামুদ্রিক সম্পদ বিশেষ করিয়া মাছ, মুক্তা ও সুক্তি উৎপাদনের উপর কর ধার্য হইবে। মহান আল্লাহ তাআলার সমুদ্র হইতে যাহা উৎপাদন করিয়াছেন তাহা হইতে এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব বাবদ দিতে হইবে।

মালিকবিহীন সম্পদ :-

দেশের যেসব সম্পদের বস্তুতই কেহ মালিক বা উত্তরাধিকার থাকবে না তাহার মালিক হইবে ইসলামী রাষ্ট্র। বায়তুল মালেই তাহা জমা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনেই তাহা ব্যয় হইবে। মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী ব্যক্তির সম্পত্তি ও সরকারি বাজেয়াপ্ত হইবে। যেসব পড়ে থাকা মাল কোথাও পাওয়া যাইবে এবং মালিক খুঁজে পাওয়া যাইবে না তাহা বায়তুল মালেই জমা হইবে।

যাকাত ও সাদকা:-

সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপর যাকাত ফরয করা হইয়াছে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ইহা বন্টন করা হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং সেই সমাজেরই গরীবদের মধ্যে তাহা বণ্টন করা হইবে।

বস্তুত সকল প্রকার বর্ধিষ্ণু বা পরিবর্ধনযোগ্য সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হইবে। ইহার লক্ষ্য হইতেছে যুগপৎভাবে ধনীর হৃদয় ও তাহার ধন-মালের পরিশুদ্ধি। আর যাকাত সঠিকভাবে আদায় করিলে যে এই উদ্দেশ্য পুরাপুরিভাবেই বাস্তবায়িত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যাকাত ধার্যযোগ্য সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম, সাধারণ প্রকাশ্য সম্পদ, যথা-গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণ প্রকাশ্যভাবেই উহাদের যাঁচাই করিতে পারে। দ্বিতীয়, অপ্রকাশিত সম্পদ, যথা-স্বর্ণ, রৌপ্য বা টাকা ও ব্যবসায়পণ্য।

ব্যবসায়-পণ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :-

সামুরা বিন্ জুন্দুব হইতে বর্ণিত হইয়াছে-তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (স) আমাদিগকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি হইতে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেছিলেন।

বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত পশুর উপর যাকাত ফরয হইবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছিলে। যেমন- বিশটি গরুর মধ্যে একটি যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে। আর ব্যবসায়ের জন্য পালিত হইলে ব্যবসার পণ্য হিসাবে মোট মূল্যের শতকরা। আড়াই টাকা (৪০ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করিতে হইবে। এই উভয়বিধ দ্রব্য-সম্পদের যাকাত আদায় করার জন্য পূর্ণ একটি বৎসর অতিবাহিত হইতে হইবে। কেননা নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

মালিকের মালিকানাধীন কোন সম্পদের পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে উহার উপর কখনো যাকাত ধার্য হইবে না।

স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়-পণ্য ও কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ সাড়ে ৫২ তোলা। অলংকারে ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্যেও উক্ত হিসাব অনুসারে যাকাত ফরয হইবে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

রৌপ্যে শতকরা আড়াই টাকা (শতকরা এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ-অর্থাৎ আড়াই টাকা) ধার্য হয়। ইহার কম পরিমাণ হইলে তাহাতে কোন যাকাত নাই।

ফকীহ আল-কাসানী লিখিয়াছেন:-

ব্যবসায় পণ্যে যাকাতযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে উহার আর্থিক মূল্য অনুযায়ী টাকার ভিত্তিতে। তাই যাহার মূল্য দুইশ' বিশ মিসকাল স্বর্ণ পরিমাণ হইবে না, উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। এই পরিমাণ হইলে তাহাতে অবশ্য যাকাত ধার্য হইবে। সর্বসাধারণ আলিম এই মতই পোষণ করেন।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

মুসলিম নারীদেরকে তাহাদের অলংকারের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দাও।

ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট উভয়ের উপর যাকাত ফরয হইবে। কারণ, এই উভয় প্রকার মুদ্রারই সমান পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা বিদ্যমান। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকায়ও এক বৎসরান্তে যাকাত ফরয হইবে। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত টাকায়ও অনুরূপভাবে যাকাত ফরয হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করা সহজ হইলে তাহা নিঃসন্দেহে নগদ টাকার সমতুল্য। অতএব তাহা হইতেও যাকাত আদায় করিতে হইবে, কিংবা তাহাতে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণের স্বর্ণ-রৌপ্য থাকিলে উহার উপরও যাকাত ধার্য হইবে।

(১) ওর্য়া ইবনে জুবাইর, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও কাসেম প্রমুখ মণীষী বলিয়াছেনঃ

এই যাকাত প্রতি বৎসরই আবর্তিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরের সেই নির্দিষ্ট মাস-যে মাসে একবার যাকাত দেওয়া হইয়াছে-না আসা পর্যন্ত যাকাত আদায় করা যাইবে না।

যাকাত সম্পর্কে নীতিগতভাবে মনে রাখা দরকার যে, ইহা কোন ট্যাক্স নয়-মূলত, ইহা অর্থনৈতিক ইবাদাত মাত্র। ট্যাক্স ও ইবাদাতের মৌলিক ধারণা ও নৈতিক ভাবধারার দিক দিয় উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই

যাকাতকে কোন দিনই যেন ট্যাক্স মনে করা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ইসলামী জনতার অন্যতম দায়িত্ব।

যাকাতকে রাষ্ট্রীয় আয় হিসাবে গণ্য করার কারণেও কাহারো মনে উক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। কেননা, মুসলমানদের সকল প্রকার সমষ্টিগত ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ও সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব বলিয়া অর্থনৈতিক ইবাদাত-যাকাত-আদায়কেও উহারই একটি খাত হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে মাত্র। প্রসঙ্গত স্বরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাকাতের যে হার নবী করীম (স) ইসলামী শরীয়াতের বিধানদাতা হিসাবে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কাহারো ক্ষমতা নাই। আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাঁচাই করিলে উহার অপ্রয়োজনীয়তাও সপ্রমাণিত হয়। কারণ, অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য শুধু যাকাতের অর্থ যথেষ্ট না হইলে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় যাকাতের হার স্বল্প মনে করিয়া উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা আল্লাহর শরীয়াতের উপর হস্তক্ষেপ এবং বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সেই জন্য এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

সাদকায়ে ফিতর :-

রমজান মাসের শেষে ঈদের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরিবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা উহার মূল্য ফিতরা বাবদ বন্টন করে উহার নাম সাদকায়ে ফিতর। এই সদকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তাহার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হইতে আদায় করিতে বাধ্য। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহাকেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জিজিয়া কর :-

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হয়, ইহাকে জিজিয়া

কর বলে অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দান করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর যে দায়িত্ব পালন করে তাহার বিনিময়ে এই কর লাভ করিয়া থাকে। ইহাও একটি রাষ্ট্রীয় আয়।

আমদানি শুল্ক :-

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক শিল্পকণ্যের আমদানির প্রতিরোধ করিতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রকেও এজন্য সর্বপ্রথম বৈদেশিক পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিতে উহার উপর শুল্ক ধার্য করতে হইবে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে তাহাদের উপরও এই শুল্ক ধার্য করতে হইবে।

জরুরী পরিস্থিতিতে কর ধার্যকরণ:-

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল কোন সময় এমন কোন পরিস্থিতিতে যদি সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া পড়ে; কিংবা ব্যয় অপেক্ষা আয় অত্যন্ত কম হইতে শুরু হয়, অথবা জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কারণে-কি কোন নতুন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য-অধিক অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অথবা সকল প্রকার আয়ের পরেও রাজ্যের সকল মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব না হয়; বা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর আরো অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে পারিবে। ইসলামী রাজনীতিবিদ ইমাম মা-অর্দীর 'আল-আহাকামুস্-সুলতানীয়া' গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে (২০৪পৃঃ) লিখিয়াছেন- 'জরুরী অবস্থায় সকল প্রকার ব্যয় বহনের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমানদের উপরই বর্তিবে, প্রয়োজনের সময় তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ আদায় করা যাইতে পারিবে।

সরকারি ঋণ :-

সাধারণভাবে রাষ্ট্র সরকারের যে আয় হইয়া থাকে সেই অনুসারেই রাষ্ট্র সরকারের যাবতীয় খরচ বহন করা উচিত। অবশ্য জরুরী পরিস্থিতিতে আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরী কর ধার্য করিয়া তাহা পূরণ করতে হয়।ইহার পরও প্রয়োজন পুরা না হইলে, তাহলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
ইসলামী রাষ্ট্র সরকারের ঋণ গ্রহণ করার অধিকার আছে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে বিপর্যয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা করিলে বায়তুল মালের দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

সরকারী ঋণের প্রকারভেদ:-

রাষ্ট্র-সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা সাধারণত দুই প্রকার হইয়া থাকে। হয় তাহা দেশে অতিরিক্ত অর্থোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হয়, নয় তাহা বিশেষ প্রয়োজনের কাজে ব্যয় করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারের বায়তুলমাল হইতে জনগণ এই উভয় উদ্দেশ্যেই ঋণ গ্রহণ করিত। অতএব জনসাধারণ যদি রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে বায়তুলমালও প্রয়োজন অনুসারে জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এবং এই ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে উহাকেও সেই সব শর্ত পালন করিয়া চলিতে হইবে যাহা সে ঋণ-গৃহীতা জনগণের উপর আরোপ করিয়া থাকে।

আধুনিক কালের রাষ্ট্র-সরকারসমূহ জনস্বার্থের খাতিরে এবং সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা- সেচ পরিকল্পনার জন্য খাল ও পুকুর খনন, বাঁধ বাধা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, সামুদ্রিক বন্দর ও বিমানঘাঁটি তৈয়ার করা, প্রাচীর ও সামরিক ঘাঁটি তৈয়ার করা, রেল লাইন, ট্রাম লাইন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন, প্রভৃতি অর্থোৎপাদক কজের জন্য প্রত্যেক সরকারই জনগণের নিকট সাময়িক ঋণের দাবি করে এবং এই ঋণ

গ্রহণের জন্য সিকিউরিটি সার্টিফিকেট জাবী ও সার্টিফিকেট গ্রহণকারীদিগকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রও প্রয়োজন হইলে এইরূপ অর্থোৎপাদক কাজের জন্য জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সে ঋণ কোন মতেই সুদভিত্তিক ঋণ হইবে না। বরং তাহার পরিবর্তে সম্মিলিত মূলধনের ভিত্তিতে পারস্পরিক ব্যবসায় হিসাবেই এই ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রকল্পের মূল মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট অংশ ঋণ-দাতাদের

মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। এই মূল প্রতিষ্ঠান হইতে সরকার নিজের সাংগঠনিক শ্রম ও দায়িত্বের বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকার যদি সাধারণ ঋণের সুদ দেওয়ার পরিবর্তে মূল ব্যবসায়ের লাভ-লোকসনে সমানভাবে শরীক থাকিবার 'সিকিউরিটি' দান করে, তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাতে মুনাফার আশায় মূলধন বিনিয়োগ করিতে-অন্ততঃ সাময়িক ঋণ দিতে-বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অনুৎপাদক কাজের জন্য-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড়, প্লাবন প্রভৃতি জাতীয় ও আকস্মিক বিপদ-আপদ প্রতিরোধের জন্যও রাষ্ট্র-সরকার জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এই ঋণ দান এবং উহা পরিশোধ করা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতই মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত হইবেঃ

তোমরাও কাহারো উপর জুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হইবে না।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় :-

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য :-

ইসলামী রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ যথাযথরূপে পালন করিতে হয়ঃ

(১) দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করা ও সেই অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠনে ব্যবস্থা করা।

(২) দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা, সেই জন্য শক্তিশালি সশস্ত্র বাহিনী এবং নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামী আদর্শে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করিয়া তোলা। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন:

তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সামর্থ্য অর্জন কর ও প্রস্তুত রাখ, প্রস্তুত রাখ প্রয়োজনীয় যানবাহন, যেন তোমরা উহার সাহায্যে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত ও বিতাড়িত করিতে সক্ষম হও।

(৩) অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সেজন্য পুলিশ ও দেশরক্ষা বাহিনী এবং আদার ও সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী উহার পরিচালানা করা।

(৪) দেশবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, অভার-অভিযোগ ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা। দুর্ভিক্ষ, বন্য, অজন্মা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা।

(৫) নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ কারার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মীরাসী আইন কার্যকর করণ,

সামাজিক জটিলতার মীমাংসা করণ। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন, বিনামূল্য শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন ও বিধিব্যবস্থা করা।

(৬) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-রাস্তা, পুল-রেললাইন, বিমানপথ টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইন ও বেতারকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি।

(৭) বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমাদানী-রফতানীর জন্য সামুদ্রিক যান বাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক-স্তম্ভ ও বিমানঘাটি প্রস্তুত করণ।

(৮) কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেচের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন, বড় বড় পুষ্করিনী, খাল ও কূপ খনন, বাঁধ বাধার আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী ও সার প্রয়োগে উৎপাদন হার বৃদ্ধি।

(৯) প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন, জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী দরকারী দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করিতে পারে।

(১০) দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মকল মিত্র দেশে রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার স্থয়ীভাবে নিয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন; দেশ-বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন করা, যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাত বা গাছ তলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য না হয়।

(১১) ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান; কৃষক, মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা।

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয় ব্যয়কে দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :-

১.কুরআন মাজীদ যেসব আয়ের খাত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়েছে -গনিমতের মাল, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অর্থ এবং বিনা যুদ্ধে সাধারণ নিয়মে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ 'ফাই' এই ভাগে গণ্য হইতে পারে। এইসব খাত লব্ধ অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল এবং রাষ্ট্র সরকার শুধু আমানতদার ও মাধ্যম মাত্র। ইহাতে কোন ব্যক্তি বা শক্তিকেই নিজস্ব বিচার বিবেচনা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার দান করা হয় নাই। তবে এই নির্দিষ্ট খ্যাতে ব্যয় করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই বিচার বিবেচনা করার অধিকার থাকিবে।

২ যে আমদানি ব্যায়ের খাত নির্ধারণ করা রাষ্ট্র সরকারের বিচার বিবেচনার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে -খারাজ, জিজিয়া শুল্কের তিন- চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য আমদানি। এইসব আমদানি ব্যায় করার ব্যাপারে পার্লামেন্টের পরামর্শ ও মঞ্জুরি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

বায়তুল মালের আমদানি কে ব্যায়ের খাতের দৃষ্টিতে ৫টি ভিন্নভাগে ভাগ করা হয়েছে :-

১.গনিমতের মাল, খনিজ সম্পদ ও তৎলব্ধ অর্থ এবং ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ।

২.যাকাত, জমির ওশরও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শুল্ক।
৩ 'ফাই ও বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ'।

৪.খারাজ,জিজিয়া, অমুসলিম সংখ্যালঘুও বৈদেশিক আশ্রয়প্রার্থী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৫.লাওয়ারিশ মাল।

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের এসব প্রকার আমদানির জন্য আলাদা আলাদা খাত ঠিক করা প্রয়োজন। যেন এক খাতে আয় অপেক্ষা ব্যায় এর পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অন্য খাতের বাঁচিয়া যাওয়া অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

কুরআনের নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত:-

(১) গণীমতের মাল: ইহার ব্যয়ের খাত কুরআন মজীদে নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ

"জানিয়া রাখ, গণীমত হিসাবে যে মাল-সম্পদই লাভ হইবে, উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, তাহার রাসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃসম্বল পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"

কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে নবী করীম (স) গণীমতের মালের বিরাট অংশ-পাঁচ ভাগের চার ভাগ-সামরিক লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র উল্লিখিত খাতে ব্যয়ের জন্য বায়তুলমালে জনা দিয়াছিলেন।

নবী করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর গণীমতের মাল পাঁচ ভাগের পরিবর্তে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হইত। খুলাফায়ে রাশেদুন কুরআনে উল্লিখিত রাসূল এবং তাঁহার নিকটাত্মীয়দের অংশ বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।২ বর্তমানকালে উল্লিখিত অংশ দুইটি বাতিল করার পরিবর্তে তাহা সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ৩

(২) 'ফাই' ও বিনাযুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদঃ ইহার ব্যয়ের খাতও কুরআন মজীদে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং

১. দূররে মুখতার-২য় খণ্ড।

২. কিতাবুল খারাজ, ১১পৃঃ কিতাবুল আমওয়াল, ৩২৫ পৃঃ।

৩. কিতাবুল খারাজ, ১১পৃঃ, কিতাবুল আমওয়াল, ৩২৬ পৃষ্ঠা

যাকাতের সম্পদ কেবল ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, তাহাদের জন্যও যাহারা তাহা সংগ্রহ করার কাজে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া আছে। তাহাদের জন্যও যাহাদের মন আকৃষ্ট করার জন্য সাহায্য দান প্রয়োজন বোধ হয়। ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে এবং ঋণগ্রস্তকে জগদ্দল ঋণভার হইতে মুক্ত করার জন্যও উহা ব্যয় হইবে। আর তাহা আল্লাহর পথেও ব্যয় হইবে, নিঃস্ব পথিকদেরও তাহা হইতে দান করা যাইবে। বস্তুত ইহা আল্লাহ তা'আলার ধার্যকৃত ফরয; আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান।

(ক) বেকার শ্রমজীবী ও রুজিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা:-

কুরআনের পরিভাষায় 'ফকীর' এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়া যে খুব মজবুত এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার করণে সে বেকার ও উপার্জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। কুরআন শরীফে ঠিক এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দিক দিয়া সেই সব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও 'ফকীর' বলা যাইতে পারে, যাহারা কোন জুলুম হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কোন সামরিক এলাকা হইতে

বিতাড়িত লোকদেরও 'ফকীর' বলা যাইতে পারে। কুরাইশদের অত্যাচারে যেসব মুসলমান হিজরাত করিয়া মদীনায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, কুরআন মজীদে তাহাদিগকে 'ফকীর' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে:-

যাকাতের সম্পদ সেই সব ফকীর-মুহাজিরদের জন্য, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং আল্লাহর 'অনুগ্রহ' ও 'সন্তুষ্টির সন্ধান করিতেছে।'

(খ) মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা:-

মজুর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থের অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গরিবদের সাহায্য দান এবং সকল প্রকার দুঃখ দুর্ভোগ ও অভাব অনটন হইতে মুক্তিদানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। যেন সমাজ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তাহারা পূর্ন শক্তি ও সামর্থ লাভ করতে পারে।

(গ)অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা :-

ফকিরদের ন্যায় মুসকীনদের জন্য ও যাকাতের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মিসকিন তাহাকেই বলা হয় দৈহিক অক্ষমতা যাহাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জন হীন করে দিয়েছে। বার্ধক্য, রোগ অক্ষমতা ও পঙ্গুতা যাহাকে উপার্জনের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করিতে পারে বটে কিন্তু যাহা উপার্জন করে তাহা দ্বারা তাহার প্রকৃত প্রয়োজন মাত্রই পুরন হয় না। অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু ইত্যাদি সকল লোককেই মিসকিন বলা হয়। ইসলাম একদিকে যেমন লোকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে

অপরদিকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বেকার পঙ্গু অক্ষম পক্ষঘাতগ্রস্থ উপার্জন ক্ষমতাহীন লোকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দানেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছে।

(ঘ) যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:-

যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। এক ভাগ যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত থাকিবে, আর অপর ভাগ তাহা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় বন্টন করার কাজ সম্পন্ন করিবে। এই উভয় কাজেই যত কর্মচারী নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের সকলের প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেওয়া এবং এই গোটা বিভাগের যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা যাকাতের আমদানী হইতেই খরচ করার অনুমতি আল্লাহ দিয়াছেন। এই বেতন প্রত্যেক কর্মচারী যোগ্যতা ও কমৃক্ষমতার অনুপাতে দিতে হইবে। কিন্তু উহার নিম্নতম হার হইতেছে নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ।

(ঙ) মুসলিমদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা:-

যাকাতের পঞ্চম অংশ ব্যয় করা হইবে 'মানুষের মন আকৃষ্ট' করার জন্য। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের মূল হইতেছে 'তালীফে কুলুব'। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, ইসলাম প্রচারের কাজ কোথাও প্রতিরুদ্ধ ও প্রতিহত হইলে, কিংবা মুসলমানদের উপর কোথাও অত্যাচার হইলে এবং তাহা টাকা দ্বারা দূর করা সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে যাকাতের এই অংশের অর্থ ব্যয় করা হইবে। যেন ফেতনা ও ফাসাদ, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি না হইতে পারে। অত্যাচারীও অনেক সময় টাকা পাইয়া অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করে; এমনকি, কখনো কখনো এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শুধু জুলুমই বন্ধ করে না, অনেক সময় ইসলামও গ্রহণ করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে সংগতিহীন নও মুসলিমকেও ইহা দ্বারা নিজ পায়ে দাড়াইবার যোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইবে।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও জনতা যদি কখনো সামগ্রিকভাবে সমধিক ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠে এবং তখন নিজদেশে এইরূপ অর্থদানের আর কোন প্রয়োজনই না থাকে, তবে এই খাতের অর্থ বৈদেশিক মুসলমান তথা মিত্র রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করা যাইতে পারিবে।

(চ) ক্রীতদাসদের মুক্তিবিধান:-

যাকাতের ষষ্ঠ অংশ ব্যয় হইবে দাসত্বের বন্ধনগ্রস্ত লোকদের মস্তক মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজে। এই অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস খরিদ করিয়া তাহাকে মুক্তি করা হইবে; ক্রীতদাস নিজে এই অর্থ লাভ করিয়া উহার বিনিময়ে নিজেকে গোলামীর বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবে।

ইসলাম-সূর্যের প্রথম উদয় লগ্নে আরবদেশে দাস-প্রথার খুব বেশী প্রচলন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারী অর্থের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রথার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে। ফলে খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এই প্রথা চূড়ান্তভাবে রহিত হইয়া যায়।

আমেরিকার দাস-প্রথা বন্ধ করার জন্য রীতিমত গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামী হুকুমাত এমন এক অর্থনীতির প্রচলন করিয়াছে যে, ইহার সাহায্যে প্রথমবার আরব দেশের এই যুগ-যুগন্তকালের প্রথাটিকে নিঃশেষে খতম করা সম্ভভ হইয়াছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যখনই যে দেশেরই এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে, সেখানেই এই অর্থনীতির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে মানব সমাজের এই বিরাট ও জটিল সমস্যা সুষ্ঠ সমাধান করা যাইতে পারিবে। শুধু তাহাই নয় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ সংগ্রাম হওয়ার ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ যদি শত্রুর হাতে বন্দি হয় তবে এই অর্থ দ্বারা মুক্ত করার ব্যবস্থা করা যাইবে।

(ছ)ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা :-

যাকাতের সপ্তম অংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে। ঋনগ্রস্ত লোক সাধারণত দুই প্রকার: (১) যাহারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূর্ণ করার

ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাহাদিগকে যাকাতের এই অংশ হইতে সাহায্য করা হইবে। (২) দ্বিতীয় সেই সব লোক, যাহারা মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। ইহারা ধনী হউক নির্ধন হউক-ঋণ শোধ করার পরিমাণ অর্থ যাকাতের এই অংশ হইতে তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(জ) বিনাসুদে ঋণ দান:-

ইসলামী রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদিগকে কেবল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবে তাহাই নয়, ইতিবাচকভাবে জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু তাহা সুদের ভিত্তিতে হইবে না। উপরন্তু যাকাতের যে অংশ ঋণ শোধ করার জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতে লোকদিগকে পূর্বাহ্নেই ঋণ দেওয়া যাইতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদী কারবার ও সুদের লেন-দেন একেবারেই জায়েয নহে। কাজেই কেহ কাহাকেও টাকা ঋণ দিলে তাহাতে কোন ক্রমেই সুদ লওয়া বা দেওয়া যাইতে পারে না। কোন নাগরিকই যাহাতে সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করিতে না পারে বা ঋণ লইয়া সুদ দিতে বাধ্য না হয়-ইসলামী রাষ্ট্রে তাহার পুরাপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদিগকে এই সুদ দেওয়া ও নেওয়ার পাপ-অভিশাপ হইতে চিরতরে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হইতে বিনাসুদের ঋণ দেওয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। বিনাসুদে ঋণ

দেওয়ার জন্য বায়তুলমালের একটি বিভাগ স্থায়ীভাবে কাজ করিবে। দেশের জনগণ- এমনকি স্বয়ং খলীফাও এই ফান্ড হইতে প্রয়োজন অনুসারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঝ) ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা:-

যাকাতের নবম অংশ ব্যয় হইবে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহ পথে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জন-কল্যাণকর কাজে-দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই- এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(ঞ) নিঃস্ব পথিকদের পাথেয় সংস্থান:-

যাকাতের দশম অংশ ব্যয় করা হইবে 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্য। যেসব লোক কোন পাপ-উদ্দেশে ঘরের বাহির হয় নাই-হইয়াছে কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এবং এইরূপ দেশ-ভ্রমণ ব্যাপদেশে তাহারা একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে যাকাতের এই অংশের টাকা হইতে এমন পরিমাণ দান করিতে হইবে যেন তাহা দ্বারা তাহাদের তাৎক্ষণিক অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং নিজ ঠিকানায় ফিরিয়া যাইতে পারে। এমন কি, যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে চাহে; কিন্তু তাহাদের পথ খরচের সংস্থান হয় না বলিয়া যাইতে পারে না, এইরূপ লোকদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল এই অংশের অর্থ হইতে যাতায়াতের খরচ দান করিবে। কোন গ্রামবাসী শ্রমিক শহরে আসিয়া উপার্জন করিতে থাকা কালে আকস্মিক অনিবার্য কারণে যদি তাহাকে গ্রামে (ফিরিয়া) যাইতে হয়, এবং তাহার পথখরচ কিছুই না থাকে, তবে তাহাকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত দরাজ করিতে বাধ্য না করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রই তাহার প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিবে।

এইসব আকস্মিক প্রয়োজনশীল লোকের নিজ নিজ ঘরে যদি বিপুল পরিমাণের অর্থ-সম্পদও থাকিয়া থাকে, তবুও তাহাকে এই সময় যাকাতের অর্থ হইতে সাহায্য দান করা শরীয়ত বিরোধী কাজ হইবে না।

যাকাতের এই অংশের অর্থ হইতে কেবল যে নগদ টাকা দিয়া বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা হইবে তাহাই নয়। পথিকদের জন্য মুসাফিরখানা, ওয়েটিং রুম, সাধারণ গোসলখানা ইত্যাদিও তৈয়ার করা যাইতে পারিবে। যেসব রাস্তাঘাট ও পুল ভাংগিয়া যাওয়ার দরুণ সাধারণ লোকদের পথ চলাচল কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তাহাও এই অংশের অর্থ দ্বারা মেরামত বা পুণনির্মাণ করা যাইবে।

কুরআনে অবর্নিত ব্যায়ের খাত:-

১.রাষ্ট্র প্রধানের বেতন প্রদান।
২.সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদান।

৩ লা-ওয়ারিস শিশু সন্তান প্রতিপালন:-

লা-ওয়ারিশ শিশু-সন্তানদের প্রতিপালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে সন্তান নিজে উপার্জনে সক্ষম নয়, যাহার নিজের কোন অর্থ-সম্পদ নাই, কিংবা যাহার কোন গার্জিয়ান বা কোন নিকটাত্মীয়ও এমন নাই যে তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে; ইসলামী রাষ্ট্রই তাহার লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী হইবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এই ধরনের সন্তানদের মোটেই নিষ্কর্ম বসিয়া খাইতে দিবে না , তাহাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশষ শিল্পকার্যে ট্রেনিং দিবে। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিস সন্তানদের সম্পর্কেও এই নীতি প্রযোজ্য হইবে।

৪.কায়েদী ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ:-

যেসব অপরোধীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইবে, যেসব অপরাধীর পৌনপুনিক অপরাধের দরুন জনগণ অতিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী পরিবেশন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অতএব তাহা বায়তুলমাল হইতে আদায় করা হইবে। যেসব লা-ওয়ারিস কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হইবে।

৫.ক্ষতিপূরণ দান:-

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সামষ্টিক কাজের জন্য কিংবা যুদ্ধের ঘাঁটি নিমার্ণ, সৈনিকদের চলাচল অথবা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নাগরিকদের বিশষ কোন ক্ষতি সাধিত হইলে উহার ক্ষতিপূরণ দান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট একজন কৃষক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সিরিয়ার একদল সৈন্যের পথ অতিক্রম করার সময় তাহার শস্যক্ষেত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি বায়তুলমাল হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার দিরহাম দান করেন।

৬.অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা:-

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামী অর্থনীতির এই সামাজিক নিরাপত্তা কেবল মুসলিম নাগরিকদিগকেই দান কার হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল দেশাবাসীই এই নিরাপত্তার লাভ করিতে পারিবে। ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যেসব স্থানে 'মিসকীন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীর ধন-সম্পদে তাহাদের অধিকারে কথা ঘোষণা করা হইঢাছে, সকল ক্ষেত্রেই ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নিঃস্ব-দরিদ্র নাগরিকদেরই বুঝানো হইয়াছে।

হযরত উমর ফারুক (রা) দেমাশক যাত্রাকালে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক খৃস্টান জনগোষ্টির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাদকার ফান্ড হইতে অর্থদান করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হযরত উমর (রা) এক বৃদ্ধ ইয়াহুদী ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহাকে ভিক্ষা করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমাকে জিজিয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা আদায় করার আমার কোনই সামর্থ্য নাই। হযরত উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন, বায়তুলমাল খাজাঞ্চীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেনঃ 'ইহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, ইহার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দাও, এবং ইহার নিকট হইতে জিজিয়া লওয়া বন্ধ কর।' অতঃপর বলিলেন: "আল্লাহর শপথ, ইহার যৌবন শক্তিকে আমরা কাজে ব্যবহার করিব, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় ইহাকে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দিব, ইহা কোনমতেই ইনসাফ হইতে পারে না"।

হযরত উমরের এই কথার শেষাংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাষ্ট্র সরকার ধনশালীদের নিকট হইতে কর, রাজস্ব ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় কারবে, যুবশক্তিকে জাতীয় কাজে নিযুক্ত করিবে, ইহা দেশবাসীর উপর রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অধিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একজন নাগরিক যখন দরিদ্র হইয়া পড়িয়া কিংবা বৃদ্ধ হইয়া উপার্জন ক্ষমতা হারাইবে, তখন তাহার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র-সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে- ইহা রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার, ইহাও যথাযথভাবে পূর্ণ করা অপরিহার্য। ইসলামী অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। দুনিয়ার পুজিবাদী ও অন্যান্য অর্থনীতির শুধু সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতনের একটা সামান্য অংশ পেনশন বাবদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার মৌলিক প্রয়োজন পুরন হয় কিনা, সেদিকে ভূক্ষেপ মাত্র করা হয় না, তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। এই কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৭.বায়তুল মাল হইতে জনগনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান:-

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাহাতে মৌলিক প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তাহার অর্থ এই নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসাইয়া খাওয়াইতে থাকিবে। বরং লোকেরা সাধ্যনুযায়ী শ্রম করিবে, উপার্জন করিবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাহাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করিবে; তাহার পরও যদি কেহ তাহার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পরিপূরণের দায়িত্ব হইবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থনীতিতে ইহাই হইল নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামী অর্থনীতিতে ভুমি বন্টন নীতি:-

জমির মালিকানা

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা এবং একচ্ছত্র মালিক। কিন্তু তাহার এই মালিকানা যে তাঁহার নিজের ভোগ-ব্যবহারের জন্য নয়, তাহা সর্বজনবিদিত। আল্লাহ্ তা'আলা নিখিল বিশ্বভূবনকে নিজ ইচ্ছায় ও নিজ শক্তির বলেই সৃষ্টি করিয়াছেন: কিন্তু সৃষ্ট জগতের এই অফুরন্ত দ্রব্য-সামগ্রীর কোন একটিও আল্লাহর ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দরকার হয় না। তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, কোন অভাব ও আবশ্যকতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার সীমাহীন নিরংকুশ ক্ষমতা কেহ সংকুচিত করিতে সক্ষম নয়। বস্তুত তিনি এই সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য-মানুষেরই ভোগ-ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব নিখিল জাহানের সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ এবং মানুষের ভোগ-ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়নের নিরংকুশ অধিকার প্রয়োগের দিক-দিয়াই

আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত ও কার্যকর হইবে। আর এইজন্যই মানুষ আল্লাহর দেওয়া বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথিবী ভোগ ও ব্যবহার করিয়াছে কিনা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার চূড়ান্ত ও পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করিবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে এককব্যক্তিকে ভূমির একচ্ছত্র মালিক করিয়া দেওয়ার জায়গীরদারী-জমিদারী ব্যবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও মর্মান্তিক। অনুরূপভাবে ব্যক্তির অধিকার হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া একান্তভাবে রাষ্ট্রের নিরংকুশ কর্তৃত্বে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার রুশীয় ও চীনা অভিজ্ঞতা আরো অধিক অমানুষিক ও হৃদয়বিদারক। এই কারণে ইসলাম এই উভয় প্রকার ভূমি নীতিকেই অস্বীকার করিয়াছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ভূমির মালিক হইতে পারে যদিও নিরংকুশ মালিকানা সে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। তদ্রুপ ভূমির উপর সমাজ ও সমষ্টির অধিকারও ইসলাম স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহাও সীমাহীন ও সর্বগ্রাসী নয়, নয় ব্যক্তি-স্বার্থবিরোধী। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ভূমিনীতির দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী পথ দিয়া চলিয়াছে ইসলামের ভূমিনীতি। ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন ও সীমাবদ্ধ ইখতিয়ারের পরিবেশে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়াছে। তাহাতে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার-জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনামূলক নীতি গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। কৃষক-চাষীকে ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইবারও অধিকার রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় নাই। ইসলামের ভূমিনীতিতে চাষযোগ্য জমি প্রধানতঃ নাগরিকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ব্যক্তি তাহা চাষাবাদ করিবে, উহার উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অংশ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা সে রীতিমত জাতীয় বায়তুলমাল-এ আদায় করিতে থাকিবে। কোন ভূমিমালিক নিজে জমি চাষ করিতে সমর্থ না হইলে বা করিতে না চাহিলে সে তাহা অন্য একজনের দ্বারা চাষ করাইবে। কারণ 'লাঙল যাহার, জমি তাহার' দাবি ইসলামী অর্থনীতির নয়, এই দাবি বা মূলনীতি ঘোষিত হইয়াছে একমাত্র মার্কসীয় দর্শনে এবং চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায়। (যদিও কার্যতঃ তাহাও শ্লোগানমাত্র, যাহার বাস্তব রূপ কোথাও দেখা যায় না।) কাজেই জমির মালিক হওয়ার জন্য বা ভোগাধিকার

লাভকরার জন্য প্রত্যেককেই নিজের হাতে চাষ করিতে হইবে-ইসলামী অর্থনীতি এমন কোন শর্ত
আরোপ করে নাই।

ভূমির ভোগাধিকার লাভের ইসলামী নীতি:-

ইসলামের ভূমি-নীতিতে জমির মালিকানা লাভ ও ভোগ দখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আবাদ ও মালিকানাধীন জমি। কেহ না কেহ উহা আবাদ করিয়া উহাতে বসবাস কিংবা কৃষিকাজ ইত্যাদি কোন-না-কোন উপায়ে উহা ভোগ দখল করিতেছে। এই জমি উহার মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমিকে অপর কেহ ভোগ ব্যবহার করিতে কিংবা উহার কোন অংশ দখল করিতে পারিবে না। তবে রাষ্ট্র ও জাতির বৃহত্তর কোন কল্যাণের প্রশ্ন উঠিলে তখন ব্যাপারটি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ কাহারো মালিকানাভুক্ত জমি হওয়া সত্ত্বেও উহা অনাবাদি পড়িয়া রহিয়াছে। উহাতে পানি সেচ করা হয় না, আগাছা-পরগাছা বা জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় না, চাষাবাদ করা হয় না, উহা বসবাসের কাজেও ব্যবহার করা হয় না।

এই জমিও মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। মালিক উহা অন্যান্য জমির ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবে এবং উহাতে উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হইবে।

তৃতীয়ত: জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট জমি। এক গ্রামবাসীর গৃহপালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি কিংবা কাষ্ঠ আহরণ ক্ষেত্র অথবা মসজিদ,

ঈদগাহ বা কবরস্থান প্রভৃতি সার্বজনীন কাজের জন্য নির্দিষ্ট জমি এই পর্যায়ে গণ্য।

কোন এক ব্যক্তি এই জমির মালিক হইবে না; বরং ইহা ব্যবহার করার ও ইহা হইতে উপকৃত হওয়ার অধিকার সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

চতুর্থতঃ অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি। উহার কোন মালিক নাই, উহা কেহই ভোগদখল করিতেছে না। এই পর্যায়ের জমি-জায়গাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় الصرات 'আল মওয়াত' বলা হয়। এই জমির পরিচয় দান প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেনঃ

ইহা জনপদের বাহিরে অবস্থিত এমন জমি, যাহার কেহই মালিক নাই, উহার উপর কাহারো একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হইবে না।

যে জমিতে সাধারণ মানুষে জন্য প্রয়োজনীয় কোন পদার্থের খনি থাকিবে, উহাতেও সর্বসাধারণের ভোগাধিকার স্বীকৃত হইবে, যতক্ষণ না কাহাকেও বিশেষভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

অনাবাদী জমি আবাদ করার অর্থ হইলঃ জমিতে বন-জঙ্গল ও আগাছা পরগাছা থাকিলে উহা কাটিয়া সাফ করা, পানি না থাকিলে উহাতে কিংবা পানিতে ডুবিয়া থাকিলে উহা হইতে পানি সিঞ্চন করা, উহাতে চাষাবাদ করা ও ফসল ফলানো; কিংবা উহাতে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা; অথবা উহাকে যে কোন প্রকারে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা।

আল্লামা মাওয়াদী লিখিয়াছেনঃ জমি আবাদ করার ব্যাপারটি দেশ চলতি প্রথা অনুযায়ীই স্বীকৃত হইবে। কেননা নবী করীম (স) তাঁহার বাণীতে এ জন্য কোন

বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করেন নাই। উহাকে দেশ চলতি প্রথার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুনেরআমলে জমি বন্টন নীতি:-

আরবদেশে যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানকার জমি জায়গার তিনটি অবস্থা ছিল। অবস্থা তিনটি নিম্নরূপঃ

(১) বহু পরিমাণ জমি ছিল ব্যক্তিদের মালিকানাভুক্ত,

(২) এমন অনেক জমিই ছিল, যাহার কেহ মালিক ছিলনা এবং

(৩) গৃহপালিত পশুর সাধারণ চারণভূমিরূপে নির্দিষ্ট ছিল অনেক জমি।

নবী করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সর্ব প্রথম মৃত, পড়ো ও মালিকবিহীন অনাবাদী জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেনঃ 'এই মৃত জমি যে আবাদ করিবে সে উহার মালিক হইবে।' লোকেরা তখন সাধ্যানুসারে জমি আবাদ করিবার ও উহার মালিক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেল। এইভাবে বহু লোকের মধ্যে মালিকবিহীন জমি বণ্টন করা হইল। (আবু দায়ূদ)

নবী করীম (স)-এর অন্তর্ধানের পর প্রথম পর্যায়ে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়। ইহার ফলে মুসলমানরা বিজয়ী হইয়া এই দুই রাষ্ট্রের বিশাল অঞ্চল দখল করিয়া লয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দখলকৃত এই বিশাল জমি-জায়গার কেহই মালিক ছিলনা। হয় উহার মালিক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, না হয় উহা আসলেই কাহারও মালিকানা ভুক্ত ছিল না বরং পারস্য ও

রোমান সাম্রাজ্যের সরকারায়াত্ত জমি-জায়গা ছিল এবং তাহাই ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আসিয়াছিল।

এই সময়ও ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাগণ এই সব জমি-জায়গা আবাদ ও ভোগদখল করার জন্য এমন লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন যাহারা উহা আবাদ করিতে ও উহাতে ফসল ফলাইতে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি বন্টনের ইহাই হইল মূল সূত্র। ইহা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক সুফল দান করিয়াছিল।

এই সকল ভূমিবন্টনে শরীয়াতি বিধান পুরাপুরি অনুসৃত হইয়াছে। ইসলামের ফিকাহবিদগণ পূর্বোল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে ভূমিবন্টনকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন ও জায়েয বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত উমর ফারুক (রা) গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ

যদি উহা জিজিয়ার জমি না হয় এবং এমন জমিও না হয় যেখানে জিজিয়ার জমির জন্য পানি প্রবাহিত হয়, তবে কেবল সেই জমিই সরকারী পর্যায়ে জনগণের মধ্যে বণ্টন করিতে পার।

ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র ব্যক্তি-মালিক বিহীন জমিই সরকারী পর্যায়ে বন্টন করা যাইতে পারে। আর এইরূপ জমি পূর্ণবন্টন সরকারী পর্যায়েই হইতে পারিবে। (كتاب الاموال ص ٢٤٨)

কাজী আবুল হাসান আল-মাওর্দী লিখিয়াছেনঃ

সরকারী পর্যায়ে জমি বন্টনকার্য কেবলমাত্র সেই সব জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাহা সরকারের দখলীভুক্ত রহিয়াছে এবং যাহাতে সরাসরি সরকারী নির্দেশ কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যে সব জমির নির্দিষ্ট মালিক রহিয়াছে এবং যে সব জমির দখলকার অন্যদের হইতে পৃথক অধিকার পাইয়াছে সে সব জমি সম্পর্কে সরকার বিনা কারণে কোন নূতন নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।

সরকারী পর্যায়ে জমি বণ্টনের ইহাই মৌকি বিধান। অতএব সাধারণভাবেও কোন সামষ্টিক কল্যান এর উদ্দেশ্য ব্যতীতই খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া ভূম্যাধিকারীদের উৎখাত করিয়া দিয়া উহাকে নিজস্ব লোকদের মধ্যে অথবা অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে পুনর্বণ্টন করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম।

এই পর্যায়ে এ কথাও বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারীভাবে যে জমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হইবে, উহার দ্বারা কোনরূপ সামন্তবাদ বা জায়গীরদারী প্রথা রচনা করা চলিবে না, যাহার পক্ষে যত পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামলানো, চাষাবাদ ও ফসল ফলানো সম্ভব হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকে ততখানি জমিই দেওয়া যাইবে। উহার অধিক পরিমাণ জমি কাহাকেও দেওয়া যাইবে না। কাহাকেও যদি আবাদ অসাধ্য পরিমাণ জমি দেওয়া হয় যাহার ফলে বহু চাষেচ্ছু বা ভূমি-শ্রমিক বঞ্চিত থাকিয়া যাইতে পারে; কিংবা জমি-মালিক যদি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে জমি সরকারী তহবিলে ফেরত লইতে ও এই কাজে সক্ষম উপযোগী লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা)-কে নবী করীম (স) প্রচুর জমি নিজে আবাদ করার উদ্দেশ্যে দিয়াছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ রাসূলে করীম (স) আপনাকে অনেক জমি দিয়াছিলেন। তাহার পরিমাণ এত বেশী যে, আপনি নিজে তাহা চাষাবাদ করিয়া পুরামাত্রায় ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। অতঃপর বলিলেনঃ

আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে পরিমাণ জমি আপনি নিজে চাষাবাদ করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পরিমাণই আপনি নিজের নিকট রাখুন। আর যাহা সামলাইতে পারিবেন না কিংবা যে পরিমাণ জমির ব্যবস্থাপনা করা আপনার সাধহাতীত, তাহা আমাদের (রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দিন, আমরা উহা অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব।

হযরত বিলাল জমি ফেরত দিতে রাযী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাধ্যাতীত পরিমাণের জমি হযরত উমর (রা) ফেরত লইলেন এবং মুসলমানচন্থর মধ্যে পুনর্বণ্টন করিলেন।

এইরূপ ভূমি বন্টনের কাজ স্বয়ং নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলদারীতেও সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ ভূমি বন্টনের পশ্চাতে দুইটি উদ্দেশ্যেই নিহিত ছিল। একটি হইল ভূমিহীন লোকদিগকে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ দান ও তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিবিধান এবং দ্বিতীয় হইল সেনাবাহিনীর মধ্যে যাহারা প্রশংসামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের এই বিরাট কাজের পুরস্কার দান। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যের পশ্চাতেও অনাবাদি ও অনুন্নত জমিকে আবাদ ও চাষোপযোগী বানানো ও তাহাতে ফসল ফলাইয়া জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন ছিল আসল লক্ষ্য।

তখন নিম্নোক্ত তিন প্রকারের জমিই বন্টন করা হইয়াছেঃ

(ক) যে সব জমির কেহ মালিক নাই, যদিও তাহা অনাবাদি ও পড়ো জমি।

(খ) যাহা শহর, নগর ও গ্রামবাসীর সাধারণ ও সামষ্টিক প্রয়োজনে আসে না।

(গ) যাহাতে সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য কোন ধাতু বা খনিজ পদার্থ অবস্থিত নহে।

এইরূপ জমি রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারে। অবশ্য সে দানের পশ্চাতে দেশ ও দেশবাসীর সাধারণ কল্যাণই লক্ষ্যরূপে নিহিত থাকিতে হইবে, নির্বিচারে বা অবিবেচনা সহকারে তাহা বলা চলিবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেন; এই পর্যায়ের জমি-যাহা আবাদ নয়, যাহার কেহ মালিক নাই, তাহা-বন্টন না করিয়া অকেজো ফেলিয়া রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই উচিত হইতে পারে না। কেননা, আবাদ করার ফলে যেমন প্রয়োজনীয় বিপুল খাদ্য ফসল লাভ করা যাইতে পারে, তেমনি সরকারের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই পর্যায়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের একটি ফরমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ

তোমাদের হাতে যেসব সরকারী জমি জায়গা রহিয়াছে তাহা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের নিয়ম অনুযায়ী জনগণকে চাষ করিতে দাও। ইহাতেও যদি উহার চাষাবাদ না হয়, তাহা হইল এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে (তিন ভাগের এক ভাগ সরকার পাইবে এবং দুই ভাগ পাইবে চাষী) তাহা চাষ করিতে দাও। আর এই শর্তে যদি কেহ জমি চাষ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে দশ ভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে চাষ করিতে দিতে পার। ইহাতেও যদি জমি চাষ না হয় তাহা হইলে কোনরূপ বিনিময় না লইয়া এমনিই চাষ করিতে দাও। এই ভাবেও কেহ চাষ করিতে না চাহিলে উহার চাষাবাদ করার জন্য বায়তুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় কর এবং কোন জমিই তোমরা বেকার থাকিতে দিবে না।

ভূমি উন্নয়ন ও বন্টন:-

রাষ্ট্র সরকারের দখলে যে সব মালিকহীন পড়োজমি থাকে, সরকার তাহা ভূমিহীন জনগণের মধ্যে বন্টন করিবে। ইসলামী অর্থনীতির ইহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য নীতি। স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এই ধরনের জমি জনগণের মধ্যে বন্টন করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত হাদীসটি এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্যঃ

নবী করীম (স) বিলাল ইবনে হারেস নামক এক ব্যক্তিকে কাবুলিয়া এলাকার উচ্চ ও নিম্ন এলাকার খনি এবং কুদসের চাষযোগ্য জমিসমূহ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন মুসলমানের হক অপরকে দেন নাই।

কালীয়া ও কুদস এলাকা মুসলিম মুজাহিদদের অধিকৃত এলাকা। এই এলাকার খনি ও চাষযোগ্য জমি রাসূলে করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বিলাল ইবনুল হারেসকে দান করিয়াছিলেন। এই সব খনি ও জমির কেহ মালিক ছিল না। কাজেই রাষ্ট্র সরকারের পক্ষে তাহা বন্টন করা খুবই সংগত কাজ। আল্লামা শওকানী উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেনঃ

এই পর্যায়ের হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ও তাঁহার পর ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে জনগণের মধ্যে খনি বণ্টন করাও সম্পূর্ণ জায়েয কাজ।

বস্তুত ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান পড়ো, মালিকহীন ও দখলহীন জমি লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে পারে।

এইভাবে যখন কোন জমি বা খনি কাহাকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, আর যদি তাহাতে দখল লইয়া চাষাবাদের কাজ করে এবং উহাকে চাষযোগ্য ও ফসল দাত্রী

বানাইয়া লয়, তখন সে উহার মালিক হইবে এবং তাহার মালিকানা কখনই হরণ করা যাইবে না।

আর যদি কোন জমি বা খনি এইভাবে বণ্টন করা হয় এবং পরে লক্ষ্য করা যায় যে, তাহা হইতে বিনা পরিশ্রমে উৎপাদন করা সম্ভব, তাহা হইলে উহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। কেননা উহার ফল তো সহজলভ্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়। কাজেই যে-ই উহা প্রথম দখল করিবে, সে-ই উহার ভোগাধিকার পাইবে। কাহারো পক্ষে উহার একচ্ছত্রভাবে মলিক হইয়া বসা এবং সাধারণ মানুষকে উহার ভোগ ও ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করার কোন অধিকার নাই।

খনি যদি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ভূমি গর্ভস্থ কোন ধাতুর হয়, যাহা মাটি ও পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং যাহা কঠিন ও কঠোর শ্রম ব্যতীত উত্তোলন ও পরিশোধন করা সম্ভব হয় না, তাহলে উহা কাহাকেও দান করা যাইতে পারে। তবে সে উহার নিরংকুশ মালিক হইয়া বসিতে পারিবে না।

এই ধরনের খনি কাহাকেও দান করা হইলে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহাতে উত্তোলোন ও পরিশোধন কার্য বন্ধ রাখিতে পারিবে না। কেননা তাহার ফলে উহার অভাবে সাধারণ মানুষের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। তাহাকে উহা দান করা হইয়াছে উহাতে কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং যত দিন তাহার পক্ষে সম্ভব সে উহাতে করিয়া যাইবে। যদি সে উহাতে কাজ বন্ধ করে, তখন উক্ত খনি তাহার অধিকার হইতে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ করিবে। ইমাম শাফেয়ীর ইহাই মত।

হাদীসের শেষ অংশ ولم يعطيه حَقَّ مُلم 'তাহাকে কোন মুসলিমের অধিকার দিয়া দেওয়া হয় নাই'-ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কেহ যদি একবার কোন জমির মালিক হয়, তাহার পর সে উহাকে বেকার ফেলিয়া রাখে, কিংবা সে জমি

হইতে সে অনুপস্থিত থাকে তবে প্রথম দান ও আবাদ করার কারণেই তাহার মালিকানা স্থায়ী হইবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি হল তাকওয়া।এখানে কোন সুদ থাকবে না, থাকবেনা কোন ঘুষ দূর্নীতি ও শোষন বঞ্চনা। রাষ্ট্রীয় অর্থ সাম্যের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে।ধনীদের থেকে গরীবদের হক আদায় করে দেওয়া হবে।ভূমিহীনদের মাঝে জমি বন্টন করে দেওয়া হবে।মোটকথা ধনী ও দরিদ্রে বিশাল তফাত হইবেনা।বর্তমান পুজিবাদী সমাজে গরীবের মাল শোষন করিয়া সব রাঘববোয়ালরা একচেটিয়া সমাজের অধিকার দখল করে আছে।সুদের রোষানলে গরীব দিন দিন গরীব হইতেছে।আর ধনীরা সুদ লাভ করিয়া ধনী হইতেছে।কেহ মৌলিক প্রয়োজন পুরা করিতে পারিতেছেনা, মাথা গোজার মত ঠাই নাই,নিত্যদিনের আহার যোগাইতে পারিতেছে না আবার কেহ দিনের পর দিন অপচয় করিতেছে সম্পদ।রাষ্ট্রীয় মালিকানার পতিত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন না হইয়া সরকারী আমলারাই ভোগ করিতেছে।ধীক শত ধীক এই পুঁজিবাদ সমাজকে।যাহারা শুধু মুনাফার ভেল্কিবাজি দেখায় অথচ তাহা শুধুই ধনীদের জন্য এবং গরীবদের শোষনের একটা আধুনিক মন্ত্র। রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতি কায়েম হইলে কোন সুদ থাকবেনা।কেহ সুদের কবলে ঋনে জর্জরিত হইবেনা।ভূমিহীনরা রাষ্ট্র থেকে আবাদী জমি পাইবে।সমাজের সবার জন্য জবাবদিহিতার ব্যাবস্থা থাকবে।কাউকে একচেটিয়া ভোগদখল করতে দেয়া হবেনা।আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার দেয়া বিধান কতই না সুন্দর।কতই না স্বচ্ছ। ইসলাম পুরো মানব জীবনের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ বিধান।আমরা শত শত বছর ধরে বহু মতবাদ এর যাতাকলে পিষ্ট হয়েছি।আমরা দেখেছি সমাজতন্ত্র ও পুজিবাদের শোষন বঞ্চনা। সমাজের দরিদ্ররা কিভাবে দরিদ্রতর ও হচ্ছে। পৃথিবীতে কোন মতবাদ ই মানুষ কে সাম্য এনে দিতে পারেনি।মানুষ কে মানুষের মর্যাদা দিতে পারেনি।ইসলাম ই দেখিয়েছে কিভাবে মানুষ মানুষে সাম্য করতে হয়।কিভাবে মানুষ কে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হয়।আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাকালেই ইসলামের

সৌন্দর্য দেখতে পাই।কিভাবে তারা একটা রূক্ষ শুষ্ক হতদরিদ্র দেশকে সোনালী করে তুলেছিল।কিভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা ও বৈষম্য দূর করেছিল।তারা একটি পূর্নাঙ্গ জবাবদিহিতার রাষ্ট্র কায়েম করেছিল।ন্যায় ও ইনসাফ ছিল তাদের রাষ্ট্রের ভিত।ধনী দরিদ্রে কোন পার্থক্য ছিলোনা।এখন আবার সময় এসেছে আওয়াজ তোলার - আমরা ইসলামী অর্থনীতি চাই।ইসলামই পারে বর্তমানের ধ্বংসশীল অর্থনীতি থেকে মানুষ কে মুক্তি দিতে।

তথ্যসূত্র:-১. ইসলামের অর্থনীতি - মাওলানা আব্দুর রহীম(রহ.)

২. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি -মুফতি তাকী উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ)